হজ, উমরাহ ও যিয়ারতের পদ্ধতি

[মাসনূন দো'আসহ]

[Bengali – বাংলা – بنغالي]



হাজী ও উমরাকারীদের হাদিয়া অফিসস্থ
ইসলামী গবেষণা পরিষদ, মক্কা



অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

صفة الحج والعمرة والزيارة مع الأدعية المسنونة



المجلس العلمي هدية الحاج والمعتمر بمكة



ترجمة: د/ محمد منظور إلهـي
مراجعة: د/ أبو بكـر محمد زكريا

সূচীপত্র




ভূমিকা




সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। পবিত্র ও বরকতময় অগণিত স্তুতি আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি সম্মানিত ঘরকে মানুষের মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছেন, যে ঘরের প্রতি রয়েছে আল্লাহর মুমিন বান্দাদের হৃদয়ের আকর্ষণ।

দুরূদ ও সালাম প্রিয় নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যিনি ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম যারা আল্লাহর ঘরে হজ ও উমরাহ পালন করেছেন, যাকে সারা জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আমানতের দায়িত্ব আদায় করেছেন, উম্মাতকে নসীহত করেছেন, আল্লাহর পথে সর্বাত্মক জিহাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁকে দীন ইসলাম সহকারে পাঠিয়েছেন। তা দিয়ে তিনি বান্দাদেরকে সঠিক পথের

দিশা দিয়েছেন এবং কুফর ও শির্কের অন্ধকার থেকে তাদেরকে মুক্ত করে ইসলামের প্রদীপ্ত সূর্যালোকে নিয়ে এসেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٢ ﴾ [الشورى: ٥٢]

“আর এভাবে আমরা আপনার কাছে অহী প্রেরণ করেছি যা আমার নির্দেশের অন্তর্গত। আপনি তো জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী! কিন্তু আমরা একে এমনই এক আলোকবর্তিকায় পরিণত করেছি যদ্বারা আমার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর আপনিতো নিশ্চয় সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শনই করেন।” [সুরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫২]

হে আল্লাহ আপনি যে শরী‘আত প্রদান করেছেন সে জন্য আপনার প্রশংসা। আপনি যে নির্দেশ দিয়েছেন সে

জন্য আপনার প্রশংসা। আপনি যা সহজ করেছেন এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে জন্য আপনার প্রশংসা।

প্রিয় মুসলিম ভাই! মক্কা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যেখানে রয়েছে মসজিদুল হারাম ও সম্মানিত কাবা ঘর। সকল স্থানেই মুসলিমদের ক্বিবলারূপে আল্লাহ একে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর অনুগত হয়ে ও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তারা প্রতিদিন পাঁচবার সে ঘর অভিমুখী হয়। মক্কা নবীগণের লালনভূমি, আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অবস্থানস্থল ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির স্থান।

প্রিয় বন্ধু! আপনি সুদূর দেশে অবস্থানকালে মক্কা মুকাররমা ও কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহর প্রতি সালাতে অভিনিবেশ করতেন, মুসল্লীগণের হারামে সালাত আদায় করার দৃশ্য অবলোকন করতেন। আল্লাহর কাছে আশা করতেন যে, আপনিও তাদের

একজন হবেন, তারা যেমন তাওয়াফ করছে আপনিও তেমনি তাওয়াফ করবেন, তাদের মতই আপনিও কা'বা চত্বরে সালাত আদায় করবেন, যমযমের পানি পান করবেন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করবেন এবং যত জায়গায় আল্লাহর ইবাদাত করা হয় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থানে আপনি তাঁর ইবাদাত করবেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করেছিলেন তিনি যেন আপনার জন্য হজ ও উমরার কাজ সহজ করে দেন। তাই তিনি আপনার জন্য তা সহজ করে দিয়েছেন এবং আপনার দো'আ কবুল করে আপনার আশা ও ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহর সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য আপনি এখন দৃঢ় সংকল্প। এ ভ্রমণে আপনাকে সাহচর্য প্রদান করে এ সম্মানিত শহরে আপনার সফরের সংকল্প করার মুহূর্ত থেকে নিরাপদে আপনার পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করা আপনার প্রতি আমাদের কর্তব্য।

হজ ও উমরার ফযীলত

আল্লাহর কাছে হজ ও উমরার ফযীলত অসীম ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার নিয়তকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নেবে এবং মহান আল কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহ মোতাবেক হজ ও উমরার সকল কাজ সমাধা করবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّه»

“যে ব্যক্তি এ ঘরে আগমন করল এবং কোনো অশালীন আচরণ করে নি ও পাপকাজে লিপ্ত হয় নি (হজ শেষে) সে ঐরূপ হয়ে ফিরে যাবে যে রূপ তার মা তাকে প্রসব করেছিল।”[1] অর্থাৎ সে এমন অবস্থায় ফিরে যাবে যে, তার সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, ঐ শিশুর ন্যায় যে কোনো পাপ বা অন্যায় করে নি।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৯ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৫৭।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ»

"এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ পালন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপের কাফফারা হয়ে থাকে। আর পূণ্যময় হজের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"[2]

প্রিয় মুসলিম ভাই!

পূণ্যময় হজ হলো সে হজ যাতে কোনো প্রদর্শনেচ্ছা (রিয়া) ও প্রসিদ্ধি লাভের লোভ নেই এবং যা পাপ ও ফিসক্ মিশ্রিত নয়। আর তা এমন - হজ পালনকারী যার সকল কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাধা করেছে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৫৫।

হজ ও উমরার হুকুম

হজ ইসলামের পঞ্চম রোকন। নবুওয়াতের যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহ এ কথার ওপর একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন এবং শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থবান প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর হজ ফরয।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [آل عمران: ٩٧]

“আল্লাহর জন্য বায়তুল্লার হজ করা এমন লোকদের ওপর ফরয যারা এর সামর্থ রাখে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

আলিমগণের বিভিন্ন উক্তির মধ্য থেকে সঠিক কথা হলো জীবনে একবার উমরাহ করা ওয়াজিব। চাই তা হজের সাথেই পালন করা হোক কিংবা বছরের অন্য যে কোনো সময়ে পৃথকভাবে পালন করা হোক। প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক এমন মুসলিম

ব্যক্তির ওপর তা আদায় করা ওয়াজিব যে মক্কা শরীফে যাওয়ার মত পাথেয় এবং সেখানে নিজের সকল প্রয়োজন মিটানোর মত অর্থের অধিকারী।

হজ ও উমরাহ কবুলের শর্ত

হজ ও উমরাহ হচ্ছে মহান আল্লাহর ইবাদাত। ছোট বড় সকল ইবাদাতেরই দুটো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে, যেন তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় এবং এ দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের যে বাসনা রাখেন তা লাভ করতে পারেন।

প্রথম শর্ত: ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই খালেছ হতে হবে। এতে মুসলিম আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির কাউকেই শরীক করবে না। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

"শরীকদের মধ্যে আমিই শির্ক থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তিই এমন কোনো কাজ করে যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে ফেলে, আমি

তাকে ও তার শির্ককে পরিত্যাগ করি।”[৩]

এর অর্থ হলো আল্লাহর সাথে নিয়তে কাউকে শরীক করা অবস্থায় আল্লাহ বান্দার আমল কবুল করেন না। এরই অন্তর্গত হলো ঐ ব্যক্তি যে ইবাদাত পালন করে এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে মানুষ হাজী বা উমরাকারী হিসাবে দেখবে কিংবা মানুষের কাছে সে তা শ্রবণ করবে। এ সবই আমল বিনষ্টকারী। সুতরাং প্রিয় ভাই এ সকল কিছু থেকে সাবধান থাকুন।

দ্বিতীয় শর্ত: ইবাদাত পালনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আল্লাহ যত ইবাদাতের নির্দেশ আমাদেরকে প্রদান করেছেন, তিনি সেসব কিছুরই বর্ণনা ও পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর মহান গ্রন্থ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় এটাই আমরা পেয়ে থাকি।

ইসলামে যে ইবাদাতই আপনি দেখুন না কেন, তা আদায়ের একটি পদ্ধতি রয়েছে। অতএব সালাতের

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৬৬।

যেমন একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি রয়েছে যাকাতেরও। একইভাবে রমযানের রোযা, হজ ও সকল প্রকার ইবাদাত পালনেরও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের আমল সমূহ পালন করতেন এবং বলতেন

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

“আমার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের হজের আমল গ্রহণ কর।”[৪]

অর্থাৎ দেখ আমি হজ ও উমরার কি কি আমল করছি এবং সেগুলো পালনে আমার অনুকরণ কর।

তিনি সে সকল অতিরঞ্জন থেকে সতর্ক করেছেন, যা আল্লাহ শরী‘আত সিদ্ধ করেননি এবং তিনি নিজেও অনুমোদন দেন নি। তিনি বলেছেন:

---

4 আস-সুনান আল-কুবরা– ৯৭৯৬, মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কাছাকাছি শব্দে, দেখুন সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৯৭।

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যে কাজে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।”[৫]

অর্থাৎ যেই এমন কোনো পন্থা ও ইবাদাত আনয়ন করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেন নি, তার সে পন্থা ও ইবাদাত প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রিয়ভাই, আপনার উচিৎ সকল ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে এ দু’টি শর্ত আপনার সম্মুখে রাখা। আপনি জানেন যে, হজ ও উমরাহ আদায়ের প্রাক্কালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আপনার ওপর ওয়াজিব তা হলো আপনার এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, আপনি কি আল্লাহর জন্য ইখলাস বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন? আপনি কি ঐভাবে হজ ও উমরাহ আদায় করেছেন, যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৪১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৯০।

ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছেন?

হে আল্লাহ! আমাদের সকল আমল আপনার জন্য খালেস করে নিন। এদ্বারা লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভের ইচ্ছা আমরা পোষণ করি না। হে রব! যেভাবে আপনি ও আপনার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন সেভাবেই আমরা তা আপনার জন্য পালন করব। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন।

প্রিয় মুসলিম ভাই!

হজ করার জন্য মক্কায় আল্লাহর সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে সফরের স্থির সিদ্ধান্ত আপনি যখন গ্রহণ করবেন, তখন আপনার পাথেয় ও খরচাদি পবিত্র ও হালাল মাল হতে চয়ন করুন। আর পূন্যবান সাথী-সহচর তালাশ করুন যারা পূন্যকাজে আপনাকে সহযোগিতা করবে ও হজ সম্পর্কিত হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে, যাতে আপনি জেনে শুনে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন এবং এমন ভুলে পতিত না হন যা

আপনার হজ বরবাদ করে দেবে। আপনার যে কোনো সমস্যায় আপনি হজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء»

“নিশ্চয় আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।”[৬]

সম্মানিত ভাই, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে এবং পবিত্র স্থান সমূহের সর্বত্র ফাতাওয়ার অফিস ও মহিলাদের জন্য ফাতাওয়া জানার উদ্দেশ্যে টেলিফোনের সুব্যবস্থা রয়েছে। হজ এবং উমরায় আপনার যে কোনো সমস্যায় আপনি আলেমদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন। এ ব্যাপারে যারা তত্ত্বাবধায়ন করছেন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মহিলাদের ওপর ওয়াজিব হলো বাবা, ভাই, ছেলে বা

[6] আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৩৬৪১) এবং এটি বিশুদ্ধ।

স্বামী কিংবা তাদের মত কোনো মাহরাম ব্যক্তির সাথে সফর করা। তবে যদি কেউ মাহরাম ছাড়াই একাকী সফর করেন এবং হজ আদায় করেন তবে তিনি গোনাহগার হবেন এবং আল্লাহ তা'আলা চাহেত তার হজ শুদ্ধ হবে।

প্রিয় ভাই! এখন আপনাকে নিয়ে এ মহান দ্বীনের আঙিনায় ও মহান একটি ইবাদাতের হুকুমে আমরা প্রবেশ করব। আল্লাহর সর্বোত্তম ভূমির দিকে আপনার সাথে আমরা যাত্রা শুরু করব, এমন ভূমির দিকে যেখানে আল্লাহ বরকত ঢেলে দিয়েছেন, যাকে তিনি নিরাপদ শহর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এখানে যারা রয়েছে তাদের সকলকে তিনি নিরাপত্তা দান করেছেন। আমরা যাত্রা করব আল্লাহর সম্মানিত ঘরের দিকে।

হজের প্রকারভেদ

হজ তিন প্রকার, এর যে কোনোটি হাজী সাহেব এখতিয়ার করতে পারেন। আর যেটিই পালন করেন না কেন, তার হজ শুদ্ধ হবে।

এ প্রকারগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

প্রথম প্রকার: তামাত্তু

আর তা হলো হজের মাসসমূহে মীকাত থেকে শুধু উমরার ইহরামের নিয়ত করা। হজের মাস সমূহ হলো শাওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন।

এ কথা বলে ইহরামের নিয়ত করবে যে, لبيك عُمْرَةً 'লাব্বাইকা উমরাতান'।

এরপর উমরার কাজসমূহ পরিপূর্ণরূপে সমাধা করবে। তাওয়াফ, সা'ঈ ও মাথার চুল হলোক করলে কিংবা ছেঁটে নিলে উমরার কাজ শেষ হবে এবং ইহরামের কারণে তার ওপর যা কিছু হারাম ছিল সবই তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। এরপর যিলহজ মাসের আট তারিখে

সে মক্কার যে স্থানে অবস্থান করবে সেখান থেকেই শুধু হজের ইহরামের নিয়ত করবে এ কথা বলে যে, لبيك حَجاً "লাব্বাইকা হাজ্জান"।

তামাত্তু হজ পালনাকারীর ওপর হাদী যবাই করা ওয়াজিব। আর হাদী হলো একটি ছাগল কিংবা উটের এক-সপ্তমাংশ অথবা গরুর এক-সপ্তমাংশ। যদি কুরবানীর জন্য হাদী না পাওয়া যায়, তাহলে হজের মধ্যে তিন দিন সাওম পালন করতে হবে এবং নিজ পরিজনের কাছে ফিরে এলে সাতদিন সাওম পালন করবে।

আলিমগণের বিশুদ্ধ মতের আলোকে হজের প্রকারভেদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তামাত্তু হজ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের সাথে হাদীর পশু না নেয়, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করবার পর সাহাবীগণকে বলেছিলেন,

«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»

"তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর হাদী নেই সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং এ কাজ গুলোকে উমরাহ হিসাবে গন্য করে।"[৭]

এ প্রকার হজ উত্তম হওয়ার আর একটি কারণ হলো - হাজী সাহেব তার সফরে হজ ও উমরার উভয়কাজ ভিন্নভাবে সম্পাদন করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার: ক্বিরান

আর তা হলো হজের মাসসমূহে মীকাত থেকে হজ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরামের নিয়ত করা। হজের কাজে প্রবেশের নিয়তের সময় একথা বলবে যে, لبيك عُمرةً و حَجاً "লাব্‌বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান"।

অতঃপর মক্কায় পৌঁছে উমরার তাওয়াফ করবে এবং হজ ও উমরার জন্য হজের সা'ঈ তাওয়াফে ইফাদার পর পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারবে। এভাবে মাথার চুল হলোক না করে কিংবা না ছেঁটে ইহরাম অবস্থায়

7 . সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৯।

থাকবে। এরপর যিলহজ মাসের আট তারিখে মিনায় রওয়ানা করবে এবং হজের বাকি কাজগুলো সমাধা করবে। তামাত্তু হজকারীর মতই ক্বিরান হজ আদায়কারীর ওপরও "হাদী" যবাই করা ওয়াজিব। তবে 'হাদী' না পেলে হজের মধ্যে তিনদিন ও পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার পর সাতদিন রোযা রাখবে।

তৃতীয় প্রকার: ইফরাদ

তা হলো হজের মাসসমূহে মীকাত থেকে শুধু হজের জন্য ইহরামের নিয়ত করবে। হজের কাজে প্রবেশের নিয়তের সময় বলবে- «لبيك حَجاً» "লাব্বাইকা হাজ্জান"।

ইফরাদকারী ক্বিরান হজ পালনকারীর মতই আমল করবে। অবশ্য ক্বিরান পালনকারীর ওপর 'হাদী' যবাই করা ওয়াজিব, আর ইফরাদকারীর ওপর 'হাদী' ওয়াজিব নয়; কেননা সে ক্বিরান ও তামাত্তুকারীর ন্যায় হজ ও উমরাকে একত্র করে নি।

এ তিন প্রকার হজের যে কোনোটি পালনের ব্যাপারে হাজীসাহেবের এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তামাত্তু - ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের সাথে হাদী এর পশু নেয় নি, যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে।

প্রিয় মুসলিম ভাই!

আপনি যখন হজ কিংবা উমরাহ করার সংকল্প নিয়ে আল্লাহর সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, তখন জেনে নিন যে মীকাত থেকে ইহরাম করাই হলো হজের কাজে আপনার প্রবেশের সূচনা। আর ইহরাম করার অর্থ হলো- হজ কিংবা উমরার কাজে প্রবেশের নিয়ত করা।

যারাই হজ কিংবা উমরাহ করার ইচ্ছা নিয়ে মক্কায় আগমন করবে, তাদের প্রত্যেককেই মীকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করতে হবে। আর মীকাত হলো সে সকল সুনির্দিষ্ট স্থানসমূহ যা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান

হতে বায়তুল্লাহ শরীফে আগমনকারীদের জন্য বর্ণনা ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন তারা সেখান থেকে বায়তুল্লায় পৌঁছার আগেই ইহরাম করে নেয়।

এ সকল মীকাত হলো নিম্নরূপ:

যুল হুলাইফা: এটা হলো মদীনাবাসি এবং যারা তাদের এ পথ দিয়ে আসবে তাদের সকলের মীকাত। মসজিদে নববী ও এ স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো তের কিলোমিটার। এটি মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত। মক্কা ও এর মধ্যকার দূরত্ব হলো চারশত বিশ কিলোমিটার। বর্তমানে এ স্থানের নাম হলো “আবইয়ার আলী”।

আল জুহফা: এটি রাবেগ শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। লোকজন এখন রাবেগ থেকেই ইহরামের নিয়্যাত করে, কেননা রাবেগ জুহফার সামান্য একটু আগে অবস্থিত। এ স্থান ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো দুইশত আশি কিলোমিটার। এটা মিশর ও শামবাসীদের মীকাত এবং সউদি আরবের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী, উত্তর

পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহের অধিবাসী এবং যারা এ পথ হয়ে আগমন করবে তাদের সকলের মীকাত।

কারনুল মানাযেল: একে বলা হয় 'আস সাইল আল-কাবীর'। মক্কা ও এর মধ্যকার দূরত্ব হলো আটাত্তোর কিলোমিটার। এটা নাজদবাসী, আরব উপসাগরীয় অঞ্চল, ইরাক ও ইরান সহ সকল পূর্বঞ্চলীয় লোকদের এবং যারা এ পথে আগমন করবে তাদের মীকাত। বর্তমানে এ মীকাতের সমান্তরালে রয়েছে "মীকাতে ওয়াদী মুহরিম" যা তায়েফের পশ্চিমে আল হাদা রোডে অবস্থিত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব পঁচাত্তর কিলোমিটার। এটা তায়েফবাসী ও তাদের পথ দিয়ে আগমনকারীদের মীকাত। এটা আলাদা কোনো মীকাত নয়।

ইয়ালামলাম: আজকাল এ স্থানটিকে বলা হয় সা'দিয়া, যা মক্কা থেকে একশত বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটা হলো ইয়ামানবাসী ও তাদের পথ দিয়ে যারা আসবে তাদের মীকাত।

যাতে ইরাক: এ স্থান হলো ইরাকবাসী ও পূর্বাঞ্চলের

লোকদের মীকাত। বর্তমানে এ স্থান পরিত্যাক্ত। কেননা সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। স্থানটি মক্কা থেকে একশত কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের হাজীগণ 'আস-সাইল আল-কাবীর' থেকে কিংবা যুল হুলাইফা থেকে ইহরামের নিয়্যাত করে থাকে।

আর মক্কাবাসীগণ হজের জন্য নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরামের নিয়ত করবে। আর উমরার জন্য তারা তান'য়ীম কিংবা হারাম সীমানার বাইরে যে কোনো স্থান থেকে ইহরামের নিয়ত করবে। হজের সংকল্প নিয়ে যে সকল মুসলিম এ মীকাতসমূহ অতিক্রম করবে তাদের প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব হলো সেখান থেকে ইহরামের নিয়ত করা। যদি হজের ইচ্ছা নিয়ে ইহরাম করা ছাড়াই কেউ স্বেচ্ছায় মীকাত অতিক্রম করে তবে তার ওপর ওয়াজিব হবে মীকাতে ফিরে এসে সেখান থেকে ইহরাম করা। তা না করলে তাকে দম দিতে হবে। আর তা হলো -মক্কায় একটি ছাগল যবেহ করে সেখানকার দরিদ্র লোকদের মধ্যে তা

বন্টন করে দেওয়া। যদি কেউ ভুলে কিংবা নিদ্রাবস্থায় ইহরাম না করেই মীকাত অতিক্রম করে, তার ওপর ওয়াজিব হলো স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ফিরে গিয়ে মীকাত থেকে ইহরাম করা। তা না করলে তাকেও দম দিতে হবে, যেরূপ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মীকাতে হজ ও উমরাকারীর করণীয় কাজ

যদি আপনি স্থল পথে গাড়ী কিংবা অন্য কোনো যানবাহনে করে মীকাত পৌঁছেন, তাহলে আপনার জন্য সুন্নাত হলো গোসল করা, সারা শরীরে সুগন্ধি মাখা এবং সম্ভব হলে নখ কাটা। তারপরে আপনার ওপর ওয়াজিব হলো ইহরামের সাদা দু'টি কাপড় তথা সিলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা। এগুলো নতুন হওয়া উত্তম, অন্যথায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। সুগন্ধি যদি এতে লেগে যায়, তাহলে আপনার উচিৎ হবে তা ধুয়ে ফেলা।

ইহরামের জন্য মহিলাদের সুন্নাতী কোনো পোষাক

নেই। বরং তারা তাদের ইচ্ছামত পোষাক পরিধান করতে পারবে। তবে তারা এমন পোষাক পরিধান করবে যা হবে মার্জিত ও শরীর আচ্ছাদনকারী। ফিতনা সৃষ্টি করার উপকরণ থেকে তাদের দূরে থাকতে হবে। পুরুষদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করলে ইহরামের জন্য মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না।

প্রিয় ভাই, যে কোনো ফরয সালাতের পর ইহরামের নিয়ত করা আপনার জন্য মুস্তাহাব। যদি ফরয সালাতের ওয়াক্ত না হয়, তাহলে অযুর দু'রাকাত সুন্নাত সালাতের নিয়ত করে তা আদায় করবেন।

এসব করা শেষ হলে আপনি আপনার সংকল্প অনুযায়ী ইহরামের নিয়ত করবেন। আপনি যদি তামাত্তুকারী হন, তাহলে বলবেন, "লাব্‌বাইকা উমরাতান" অথবা ক্বিরানকারী হলে বলবেন, "লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান" কিংবা যদি ইফরাদকারী হন তাহলে বলবেন " লাব্বাইকা হাজ্জান"।

এরপর তালবিয়া পড়া শুরু করে আপনি সে রকমই

বলবেন, যেমন আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম করে তালবিয়া পাঠের প্রাক্কালে বলেছিলেন:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্‌বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্‌বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা।"[৮]

অর্থ: "আমি হাযির, হে আল্লাহ আমি হাযির, আমি আপনার কাছে হাযির। আপনার কোনো শরীক নেই। আমি আপনার কাছে হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, অনুগ্রহ ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।"

আর জলপথে কিংবা আকাশ পথে আপনার আগমন হলে এ প্রথাই চলে আসছে যে, প্লেনের পাইলট ও

[৪] ৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯, ১৫৫০ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৮, ২৮৬৯।

জাহাজের ক্যাপ্টেন যাত্রীদেরকে মীকাতের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দেন, যাতে হাজীগণ ও উমরাকারীগণ তাদের ইহরামের কাপড় পরিধান করার প্রস্তুতি নেন। এরপর মীকাত বরাবর পৌঁছলেই তারা সকলে ইহরামের নিয়ত করেন, ঐভাবে যা ইতোপূর্বে আপনার উদ্দেশ্যে আমরা বর্ণনা করেছি। এ অবস্থায় বাড়ী থেকে ইহরামের কাপড় পরিধান করে রওয়ানা হয়ে প্লেনে কিংবা জাহাজে আরোহণ করায় কোনো অসুবিধা নেই। অতঃপর মীকাত বরাবর পৌঁছার সংবাদ যখন জানতে পারবেন, তখন ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করবেন।

হাজীদের উচিৎ বেশি বেশি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা। তবে মেয়েরা এতটা নিম্নস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে যে, শুধু তারা নিজেরাই তা শুনতে পাবে। উমরাকারী তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। আর হাজীগণ হজের ইহরাম করার পর থেকে কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধকাজসমূহ

প্রিয় ভাই! হজ ও উমরার কাজে প্রবেশের সাথে সাথে আপনার ওপর অনেকগুলো কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সে কাজগুলো আপনার জন্য হারাম হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয় "ইহরামের নিষিদ্ধকাজ"।

আর তা হলো:

1. কেটে বা অন্য কোনোভাবে চুল উপড়ে ফেলা এবং হাত বা পায়ের নখ কাটা। অবশ্য হাত দ্বারা মুহরিম ব্যক্তির মাথা চুলকানো জায়েয যদি তা প্রয়োজন হয়। এতে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো চুল পড়ে যায় অথবা মুহরিম ব্যক্তি তা ভুলে কিংবা হুকুম না জেনে করে ফেলে, তাহলে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

2. ইহরামের পর কাপড়ে কিংবা শরীরে কিংবা অন্যত্র সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে ইহরামের আগে মাথায় ও দাঁড়িতে যে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়েছে তা ইহরামের পর বাকী থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।

3. মুহরিম ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম করতে পারবে না, যৌন উত্তেজনার সাথে স্ত্রীকে স্পর্শও করবে না, স্ত্রীকে চুমু খাবে না এবং যৌন কামনার বশবর্তী হয়ে তার দিকে তাকানো যাবে না। মুহরিম ব্যক্তি মহিলাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে না এবং নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বিয়ের আকদ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে।

4. মুহরিম ব্যক্তি হাত মোজা ব্যবহার করবে না।

5. মুহরিম ব্যক্তির জন্য খরগোস ও কবুতর প্রভৃতির ন্যায় কোনো স্থলজ শিকারী প্রাণীকে হত্যা করা অথবা পশ্চাদ্ধাবন করা কিংবা সে কাজে সাহায্য করা নিষিদ্ধ। মুহরিম ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। আর মুহরিম নয় এমন ব্যক্তির জন্য হারাম শরীফের সীমানার ভেতর অবস্থানকালে শিকার করা নিষিদ্ধ।

6. সর্বাঙ্গে অথবা শরীরের কোনো অঙ্গে জামা কিংবা পাজামা, গেঞ্জি, পাগড়ী, টুপী ও মোজার ন্যায়

সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। তবে যদি কেউ লুঙ্গির কাপড় না পায় - যেমন কেউ তা নিতে ভুলে গিয়েছে এবং প্লেনের মধ্যে অবস্থান করছে এমতাবস্থায় সে যেকোন কাপড় পরিধান করবে। আর তাও না পেলে পাজামা পরে ইহরাম করবে। অনুরূপভাবে যদি সেন্ডেল না পায় তাহলে মোজা পরতে পারবে এবং আল্লাহ চাহেত এতে কোনো অসুবিধা হবে না।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য সেন্ডেল, হাত ঘড়ি, আংটি, চশমা, কানে শোনার যন্ত্র, বেল্ট এবং টাকা-পয়সা ও কাগজপত্র হিফাযতের ব্যাগ ব্যবহার করা জায়েয।

7. মুহরিম ব্যক্তি পুরুষ হলে মাথার সাথে লেগে থাকে এমন কিছু যেমন ইহরামের কাপড় বা পাগড়ী, রুমাল কিংবা টুপি দিয়ে মাথা ঢাকা হারাম।

তবে ছাতা, তাঁবু কিংবা গাড়ীর ছাদের ছায়ায় থাকলে অথবা মাথার ওপর বোঝা বহন করলে কোনো অসুবিধা নেই। মুহরিম ব্যক্তি যদি ভুলে কিংবা হুকুম

না জেনে মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে তার ওপর ওয়াজিব হলো যখনই স্মরণ হবে কিংবা হুকুম সম্পর্কে জানতে পারবে আবৃতকারী বস্তুটি সরিয়ে ফেলবে। আর এতে তার ওপর কোনো দম আসবে না।

8. ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের হাত মোজা পরিধান করা নিষিদ্ধ ও নেকাব দিয়ে মুখ ঢাকা হারাম। নেকাব হলো দেখার জন্য দু'চোখ খোলা রেখে যদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করা হয়। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য এসবের কোনোটাই বৈধ নয়। তাদের জন্য ওয়াজিব হলো তারা পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কিংবা পুরুষরা তাদের পাশদিয়ে যাওয়ার সময় শরী'আত সম্মত ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা, যা মাথার উপরের দিক থেকে মুখের ওপর ছেড়ে রাখবে।

9. মুহরিম এবং মুহরিম নয় এমন ব্যক্তির জন্য হারাম শরীফের গাছ পালা এবং মানুষের চেষ্টা-চরিত্র

ছাড়াই জন্মে এমন সবুজ তৃণলতা কাটা নিষিদ্ধ। হারাম শরীফের মধ্যে পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া যাবে না, অবশ্য মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রচার করার জন্য তা উঠানো যাবে[9]।

কখনো আপনার ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা কিংবা পরিস্কার করা এবং মাথা ও শরীর ধৌত করার প্রয়োজন হতে পারে। এসব কিছু করা জায়েয। এর ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো চুল পড়ে গেলে তাতে আপনার কোনো অসুবিধা নেই।

হজ ও উমরাহ পালনকারী ভাই!

হজ ও উমরার কাজে প্রবেশের ফলে আপনার ওপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে সকল পাপ থেকে দূরে থাকা এবং

[9] তবে বর্তমানে পৌঁছানোর দায়িত্ব না নেয়াই উচিত। কারণ, সরকারের পক্ষ থেকে কখনও কখনও এর মাধ্যমে চোর ধরার ব্যবস্থা করা হয়; আপনি হয়তো ভালো নিয়তে গ্রহণ করলেন, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত লোকেরা সেটাকে চুরি হিসেবে গ্রহণ করবে। সুতরাং পড়ে থাকা বস্তু কোন অবস্থাতেই হাতে নিবেন না। [সম্পাদক]

বেশি বেশি যিকির ও তালবিয়া পাঠ করা। গীবত (পরনিন্দা), চোগলখুরী (অন্যের দোষ প্রচার করা), অশ্লীল কথা বার্তা ও ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি যা কোনো কোনো লোক বহুল পরিমাণে করে থাকে - আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুন - তা দ্বারা আপনি আপনার হজ ও উমরাকে বিনষ্ট করা থেকে সতর্ক থাকুন।

অনুরূপভাবে আপনার ওপর আরো ওয়াজিব হলো - আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে আপনার চোখ ও কানকে সংযত রাখা এবং আপনার প্রভুর প্রতি মনোযোগী হওয়া ও তাঁর ইবাদাতে মশগুল থাকা।

আপনার কর্তব্য হলো সর্বদা তালবিয়া, যিকির ও কুরআন পাঠে মগ্ন থাকা। আর আপনার পুরো সফরটাই ইবাদাত ও যিকরে পরিণত হওয়া উচিৎ। প্রত্যেক হাজীর জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দো'আ করি তিনি যেন তাদের হজ কবুল করেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহর কাছে আমাদের আরো প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের উত্তম আমল ও উত্তম বস্তু চাওয়ার

তাওফীক দেন।

মক্কা ও মসজিদুল হারামে প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করে গোসল করেছিলেন।[১০] অতএব, মক্কায় পৌঁছার পর আপনার জন্য গোসল করা সুন্নাত। অযু এবং গোসল করার জন্য মসজিদুল হারামের আশেপাশেই বহু স্থান তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে দো‘আ করি তিনি এ কাজের পূণ্য সে ব্যক্তিরবর্গের নেকীর পাল্লায় রেখে দিন, যারা আল্লাহর মেহমানদের জন্য এগুলো স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্থাপন করেছেন। এরপর আপনি উমরার কাজগুলো সমাধা করার জন্য তালবিয়া পড়তে পড়তে কা‘বার উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামের দিকে গমন করবেন।

মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় আপনার জন্য সুন্নাত হলো ডান পা আগে বাড়িয়ে দেওয়া এবং এ দো‘আ পড়া:[১১]

---

10 বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

11 এ হাদীসের প্রথম অংশ “ বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু’ ইবনুস সুন্নি বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী তা সহীহ বলেছেন। আর

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسُوْلِ الله، اللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْــوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَــدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»

“আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। **দ**ুর‍ূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আপনার অনুগ্রহের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহ, তাঁর সম্মানিত চেহারা ও সত্ত্বা, আর অনাদি শক্তির উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।

সকল মসজিদে প্রবেশের সময়ই এ দো‘আ পড়তে হয়। এরপর উমরার তাওয়াফ শুরু করার জন্য কা‘বার দিকে অগ্রসর হবেন। তাওয়াফ অবস্থায় আপনার ওপর ওয়াজিব হলো পাক-পবিত্র থাকা। এ তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষদের জন্য সুন্নাত হলো ইদতিবা’

‘ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ ...’ বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। আর ‘আঊযুবিল্লাহিল আযীম’ থেকে শেষাংশ আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহীহহুল জামে গ্রন্থে একে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

করা। আর ইদতিবা’ হলো- ইহরামের চাদরের মধ্যবর্তী অংশ ডান বোগলের নিচে রেখে, ডান কাঁধকে খোলা রেখে চাদরের দু’প্রান্তকে বাম কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া। তাওয়াফ শুরু করা অবস্থায় তালবিয়া পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

উমরার তাওয়াফ

তাওয়াফ শুরু করার পদ্ধতি হলো- হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হয়ে ডান হাত দিয়ে আপনি তা স্পর্শ করবেন এবং এতে চুম্বন করবেন। যদি হাত দিয়ে পাথরটিকে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেদিকে ফিরে ডান হাত দিয়ে ইশারা করবেন। তবে হাতে চুম্বন করবেন না। ইশারা করার সময় বলবেন "আল্লাহু আকবার।[12]

আর যদি বলেন, 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' তবে তা উত্তম।[13]

তাওয়াফের শুরুতে আপনার জন্য নিম্নের দো'আটি পড়া সুন্নাত:

اللّهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ وَتَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْـدِكَ وَاتِّبَاعاً لِسُـنَّةِ

---

[12] বুখারী তা বর্ণনা করেছেন ।

[13] ইবন উমার থেকে অনুরূপ সাব্যস্ত হয়েছে,যা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন (৫/৭৯), হাফেজ ইবনে হাজার আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে বলেন, এর সনদ শুদ্ধ (২/২৪৭)

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

“হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে, আপনার কিতাবকে সত্য প্রতিপন্ন করে, আপনার প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করে এবং আপনার রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করে (আমি তাওয়াফ শুরু করছি)”।[14]

উমরাকারীর জন্য উত্তম হলো ভীড় না জমানো এবং ঠেলাঠেলি, গালি গালাজ ও ঝগড়াঝাটি করে মানুষকে কষ্ট না দেওয়া। কেননা এটা এমন ত্রুটি যাতে ইবাদাতের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

এরপর হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে কা‘বাকে বাম পাশে রেখে সাত চক্কর তাওয়াফ শুরু করুন। এ অবস্থায় যিকির ও ইস্তিগফার করতে থাকুন এবং ইচ্ছামত দো‘আ ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দো‘আ করুন। তবে স্বর উচ্চ করে নির্দিষ্ট কোনো

[14] প্রাগুক্ত গ্রন্থটি দেখুন। বিশেষ করে তা ইবন উমর ও কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যদিও কোন কোন বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। [সম্পাদক]

দো'আ পাঠ করবেন না, যেমন অনেকে করে থাকে। কেননা এতে তাওয়াফকারী অন্য সকল ভাইদের সমস্যা হয়।

আপনি যখন রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছাবেন, তখন সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করুন। তবে তাতে চুম্বন করবেন না এবং তা মাসেহও করবেন না, যেমন কতেক লোকেরা করে থাকে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কাজ সাব্যস্ত হয় নি। আপনি আপনার তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে স্পর্শ করার কাজটি করবেন। আর রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে সেদিকে কোনোরূপ ইশারা না করে ও 'আল্লাহু আকবার' না বলেই এগিয়ে যাবেন। রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নের দো'আটি পড়া আপনার জন্য সুন্নাত:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান

করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন”। [সূরা আল-বাক‍ারা, আয়াত: ২০১][15]

এভাবেই উমরাকারী প্রত্যেক চক্কর হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে সেখানে এসে চক্কর শেষ করে তার সাত চক্কর তাওয়াফের কাজ চালিয়ে যাবে। যখনই হাজারে আসওয়াদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে, তা স্পর্শ করে চুম্বন করবে এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে। হাজারকে স্পর্শ ও চুম্বন করা সম্ভব না হলে সে বরাবর আসলে ডান হাত দিয়ে সেদিকে ইশারা করে একবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে।

তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত। রমল হচ্ছে, ঘন পা ফেলে দ্রুত চলা, তবে তা করতে সক্ষম না হলে কোনো দোষ নেই। কেননা তা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

15 আহমাদ,আবু দাউদ ও ইবন খুযাইমা এ দো‘আটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী একে সহীহ করেছেন ।

তাওয়াফের কাজ শেষ হলে দ্রুত আপনার ডান কাঁধ ঢেকে নিন। আর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত পড়া আপনার জন্য সুন্নাত, যদি তা সহজসাধ্য হয়। তবে যদি ভীড় বা অনুরূপ কোনো কারণে সেখানে সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদুল হারামের যে কোনো জায়গায় দু'রাকাত সালাত পড়ে নিন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' পড়ুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' পড়ুন।[16]

অবশ্য এ দু'সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই।

জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ সম্পন্ন করে যমযমের কাছে গিয়ে যমযমের পানি পান করেছিলেন।[17] সুতরাং আপনিও যখন

---

16 মুসলিম এ বিষয়টি বর্ণনা করেন।

17 আহমাদ এটা বর্ণনা করেন।

তাওয়াফের কাজ শেষ করবেন, আপনার জন্য তখন সুন্নাত হলো যমযমের কাছে গিয়ে তা থেকে অথবা পানের জন্য রক্ষিত পাত্র থেকে যমযমের পানি পান করা। এরপর আপনার জন্য সহজসাধ্য হলে হাজারে আসওয়াদের কাছে ফিরে এসে একে চুম্বন করা মুস্তাহাব। আর তা যদি সম্ভব না হয় বিশেষ করে ভীড়ের সময় তাহলে তা ছেড়ে দিতে পারেন।

তাওয়াফের সময় হজ ও উমরাকারীদের কতিপয় ত্রুটি

কা‘বা শরীফের তাওয়াফের সময় কতিপয় হজ ও উমরাকারীদের অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের ভুল ত্রুটিতে আপনি যাতে লিপ্ত না হন সে জন্য তেমনি কিছু ভুলের ব্যাপারে আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

- কতিপয় তাওয়াফকারী কাবার সকল রুকন (কর্ণার) এবং হয়ত বা সকল দেওয়াল স্পর্শ করে থাকে। তারা মাকামে ইবরাহীম সহ এগুলোকে মাসেহ করে থাকে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া কা‘বার অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করেন নি।
- কিছু লোক তাওয়াফের সময় আওয়াজ উচ্চ করে। এতে বাকী তাওয়াফকারীদের অসুবিধা হয়। অনুরূপভাবে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্য এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে সালাত আদায়ের জন্য অনেকে প্রচণ্ড ভীড় সৃষ্টি করে।

এতে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ঘটে। অনেক সময় গালাগালি ও হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। এমনটি করা জায়েয নেই; কেননা এতে নারী-পুরুষের ফেতনা সৃষ্টি হয় এবং মুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। তদুপরি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিম তার ভাইকে গালি দেওয়া, মারধোর করা কখনোই জায়েয নয়।

মূলতঃ যে ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে ত্রুটি করেছে অথবা আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই হওয়া উচিৎ এ স্থানে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

- তাওয়াফকারীদের কেউ কেউ তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ দো'আ নির্ধারণ করে থাকে, যা তারা এ ব্যাপারে প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকে পাঠ করে থাকে। এটা নতুন উদ্ভাবিত সে বেদআ'ত সমূহেরই অন্তর্গত দ্বীনের মধ্যে যার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াফের মধ্যে হাজারে আসাওয়াদের

কাছে এসে তাকবীর পড়া ছাড়া অন্য কোনো যিকির বা দো‘আ সাব্যস্ত হয় নি। আর প্রত্যেক চক্করের শেষে হাজারে আসাওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে তিনি বলতেন:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

“হে আমাদের রব! আপনি দুনিয়ায় আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে হিফাযত করুন।” [সুরা আল বাক্বারা: ২০১]

সুতরাং প্রথম চক্করের জন্য, দ্বিতীয় চক্করের জন্য, ...এমনি করে সপ্তম চক্কর পর্যন্ত কোনো চক্করের জন্যই বিশেষ কোনো দো‘আ পাঠে নিজেকে বাধ্য না করা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেরই অন্তর্গত। এ বইয়ের শেষে একগুচ্ছ নির্বাচিত দো‘আ সংযোজন করা হয়েছে যেগুলো কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত

হয়েছে। আপনি সেগুলো পড়ে আল্লাহর কাছে দো‘আ করুন। আল্লাহ চাহেত এ গুলোই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।

উমরার সা‘ঈ

প্রিয় উমারাকারী ভাই!

এরপর আপনি অগ্রসর হোন সা‘ঈ করার স্থানের দিকে যেখানে রয়েছে সাফা ও মারওয়া। এ গুলো হলো সেই দু’টি পাহাড় যার ওপর আরোহণ করেছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী আমাদের মা হাজেরা, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় রবের নির্দেশে তাকে সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। তার ও তার ছেলে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রচণ্ড পিপাসা পেলে তিনি এমন লোকের সন্ধানে সাফার উপর উঠলেন যে তাদেরকে পানি পান করাবে। অতঃপর সাফা থেকে নেমে একটু হেঁটে দ্রুত বেগে পদক্ষেপ ফেলতে শুরু করলেন। এরপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়ায় পৌঁছলেন। তাকে ও তার ছেলেকে পানি পান করানোর

মত লোকের সন্ধানে তিনি মারওয়ায় উঠলেন। শেষ পর্যন্ত এ দুরবস্থা থেকে আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিলেন এবং তার ছেলে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সামনে পানি নির্গত করলেন। আপনি যখন সাফার নিকটবর্তী হবেন, তখন পড়ুন আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨﴾ [البقرة: ١٥٨]

“নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। আর যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ কিংবা উমরাহ করবে, সে যদি এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করে, তবে তার কোনো পাপ হবে না। যে স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ (তার) প্রতিদান দাতা ও তা অবগত।” [সুরা আল বাক্বারা:১৫৮][১৮]

সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে তাতে উঠার আগেই এ আয়াতটি পড়বেন। এ স্থানে এবং সা‘ঈর প্রথম চক্করের

[18] এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

শুরুতেই শুধুমাত্র এ আয়াতটি পড়বেন। প্রত্যেক চক্করে পাঠের পুনরাবৃত্তি করবেন না। এরপর সাফা পাহাড়ে উঠবেন। তবে পাহাড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উঠার প্রয়োজন নেই। পাহাড়ের সমতল স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত কিছুদূর উঠলেই চলবে। এরপর ক্বিবলামুখী হয়ে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবেন। তারপর পড়ুন:

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

"একক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। একক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি স্বীয় অঙ্গিকার পূরণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই দলসমূহকে পরাজিত করেছেন।"[১৯]

---

19 মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন।

এ যিকিরটি তিনবার পড়ুন। এগুলোর মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের যত কল্যাণ পেতে চান সেজন্য দো‘আ করুন। যদি এর চেয়েও কম পড়ে থাকেন তবে আল্লাহ চাহেত কোনো অসুবিধা নেই। দো‘আ করার সময়ই শুধু আপনার হাত উঠাবেন। তিনবার আল্লাহু আকবার বলার সময় হাত উঠানোর প্রয়োজন নেই।

এর পর সাফা থেকে নেমে স্বাভাবিক চলার গতিতে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকুন এবং নিজের জন্য, নিজের পরিবার ও মুসলিম ভাইদের জন্য যথাসাধ্য দো‘আ করুন। তারপর সবুজ সংকেতের সামনে এসে পৌঁছলে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে দৌড়াতে থাকুন, যতক্ষণ না অপর সবুজ সংকেতের কাছে পৌঁছে যান। এরপর স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে থাকুন এবং মারওয়ায় উঠা পর্যন্ত চলতে থাকুন। মারওয়ায় পৌঁছে তাতে উঠে কেবলামুখী হোন এবং সাফায় যা যা বলেছিলেন এখানেও তা বলুন, তিনবার তাকবীর দিন। অতঃপর সম্ভব হলে তিনবার বলুন:

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه»

এর মধ্যে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দো‘আ করতে পারেন।

তারপর নেমে সবুজ সংকেতের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত হাঁটতে থাকুন। সবুজ সংকেতে পৌঁছলে অপর সংকেত পর্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়াতে থাকুন। এরপর সাফা পাহাড়ে উঠা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে থাকুন।

এ নিয়মে আপনি সাত চক্কর সা‘ঈ পূর্ণ করবেন। সাফা থেকে শুরু করবেন এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবেন। সাফা থেকে মারওয়ায় গমন একটি চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসা আর একটি চক্কর বলে গণ্য হবে।

হেঁটে সা‘ঈ শুরু করার পর যদি আপনি ক্লান্তি বোধ করেন তাহলে বিশ্রাম নেয়ায় কোনো দোষ নেই। আপনার জন্য হুইল চেয়ারে করে সা‘ঈ করাও জায়েয।

সা'ঈ করা অবস্থায় সালাত শুরু হয়ে গেলে আপনি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করুন এবং যেখানে থেমেছেন সেখান থেকে পুনরায় সা'ঈ শুরু করুন।

সা'ঈ করার সময় পাক পবিত্র থাকা মুস্তাহাব। অবশ্য উমরাকারী নাপাক (অযুহীন) অবস্থায় সা'ঈ করলে তা আদায় হবে। অনুরূপ তাওয়াফের পর কোনো মহিলার হায়েয বা নিফাস হলে সে সা'ঈ করতে পারবে এবং তা আদায় হয়ে যাবে। কেননা সা'ঈতে পাক হওয়া শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব।

উমরার শেষ করণীয়

প্রিয় ভাই! আপনি যখন সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে সা'ঈ শেষ করবেন, এমতাবস্থায় আপনি আপনার মাথার চুল হলোক করবেন যদি আপনি তামাত্তুকারী হন এবং হজের সময় যদি ঘনিয়ে না আসে, বরং হজের এতটুকু সময় বাকি থাকে যাতে আপনার চুল লম্বা হতে পারে। আর হজের সময় নিকটবর্তী হলে আপনি আপনার চুল ছোট করে ছাঁটবেন। মাথার সবখান থেকে চুল ছোট করতে হবে। কতিপয় লোকের মতো কোনো এক অংশ থেকে ছোট করলে যথেষ্ট হবে না।

মেয়েরা তাদের চুলের গোছা থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ অংশ কাটবে।

হলক কিংবা চুল ছাঁটার মাধ্যমে আপনি আপনার উমরাহ পরিপূর্ণ করলেন এবং এমনভাবে আপনি আপনার ইবাদাতটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করলেন, যেভাবে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়মে আদায় করেছেন। এরপর আপনার জন্য সে সব কিছূ হালাল হয়ে যাবে যা ইহরামের কারণে আপনার ওপর হারাম হয়ে গিয়েছিল। এখন আপনি আপনার স্বাভাবিক পোষাক পরতে পারবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন, আপনার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হয়ে যাবে। এভাবে ইহরামের সকল নিষিদ্ধ কাজগুলোও হালাল হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি যদি ক্বিরানকারী বা ইফরাদকারী হন, তাহলে মাথার চুল হলোক করবেন না, এবং ছোটও করবেন না, বরং কুরবানীর দিন হজ থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার ইহরাম অবস্থার মধ্যেই থেকে যাবেন।

তারবিয়ার দিন তথা যিলহজ মাসের ৮ তারিখে হাজীর করণীয় কাজসমূহ

তারবিয়ার দিন তথা যিলহজ মাসের আট তারিখ সমাগত হলে তামাত্তুকারী যিনি উমরাহ করার পর হালাল হয়েছেন তার জন্য মুস্তাহাব হলো তিনি যে বাসস্থানে আছেন সেখান থেকে চাশতের সময় হজের ইহরাম করা। একইভাবে মক্কাবাসীদের যারা হজ করতে চান, তারা নিজ নিজ গৃহ থেকেই ইহরাম করবেন।

আর ক্বিরান ও ইফরাদকারী যারা তাদের ইহরাম থেকে হালাল হননি তারা তাদের প্রথম ইহরামের ওপরই বলবৎ থাকবেন।

তামাত্তুকারী এবং যারা হজ পালন করতে চান, এদিন তারা ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন এবং গোসল, পাক সাফ হওয়া, খুশবু লাগানো ইত্যাদি যেসব কাজ মীকাতে করেছিলেন তা করবেন। এরপর অন্তরে হজের নিয়ত করবেন এবং মুখে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলে

নিম্নোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»

ইতোপূর্বে এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

এদিন সূর্য ঢলে পড়ার আগেই সকল হাজী সাহেবগণ মিনার পবিত্র ভূমির দিকে রওয়ানা হবেন, চাই তারা তামাত্তুকারী হন কিংবা ক্বিরানকারী কিংবা ইফরাদকারী। তারা সেখানে গিয়ে যোহর ও আসরের প্রত্যেক সালাত ওয়াক্ত অনুযায়ী দু'রাকাত করে আদায় করবেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের সময় তিন রাকাত মাগরিবের সালাত আদায় করবেন। এশার সময় দু'রাকাত এশার সালাত এবং নয় তারিখের ফজরের সালাত দু'রাকাত আদায় করবেন।

হজ পালনকারী ভাই!

আপনার জন্য আরাফার রাত মিনায় যাপন করা মুস্তাহাব, যেভাবে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। ফজর পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সূর্য উদিত হলে মিনা থেকে তালবিয়া পড়তে পড়তে ও তাকবীর দিতে দিতে আপনি ‘আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হবেন।

যিলহজ মাসের নয় তারিখ আরাফার দিন হাজীসাহেবদের করণীয়

আরাফার দিন একটি বরকতময় দিন। এ দিনটির বহুবিধ কল্যাণের কারণে এবং এ দিন ফেরেশতাগণ ও রহমাত নাযিল হওয়ায় আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে এর শপথ করেছেন। আরাফার দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিন শয়তানকে এত বেশি অপমানিত ও অপদস্থ হতে দেখা যায় না।

প্রিয়ভাই! আপনি যখন আরাফায় পৌঁছবেন তখন আপনার জন্য মুস্তাহাব হলো সম্ভব হলে নামিরায় অবতরণ করে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা, যেভাবে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। আর যদি নামিরায় অবতরণ সম্ভব না হয় তাহলে আরাফার সীমানার ভেতর অন্য কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। নির্দেশনাদানকারী চিহ্ন ও বোর্ড দ্বারা ‘আরাফার সীমানা বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

আপনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফায় অবস্থান করবেন। আপনার পুরো সময়টাই আপনি তালবিয়া পাঠ করে, দো‘আ ও ইস্তিগফার করে এবং আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করবেন। সূর্য ঢলে পড়লে এবং যোহরের ওয়াক্ত হলে ইমাম সাহেবের জন্য খুতবা দেওয়া সুন্নাত। খুতবায় তিনি এ দিন এবং পরবর্তীতে হাজী সাহেবদের জন্য কি কি কাজ বিধিসম্মত তা বর্ণনা করবেন এবং মানুষকে উপদেশ দিবেন, ইসলামের হুকুম আহকাম তাদের স্মরণ করিয়ে দিবেন, স্বীয় রব, পরিবার ও মুসলিম ভাইদের প্রতি কি কর্তব্য রয়েছে তা বর্ণনা করবেন, যেরূপ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।

এরপর আপনি যোহরের সময় একটি আযানে ও দু’টি একামাতে যোহর ও আসর সালাত একত্রে কসর করে পড়বেন। এ দু’ সালাতের পূর্বে, মধ্যখানে ও পরে আর কোনো সালাত পড়বেন না।

প্রিয় ভাই! সালাত পড়া শেষ করে আপনি এ সময়টিতে

ইবাদাতে মনোনিবেশ করতে সচেষ্ট হোন। এ বিশাল সুযোগ যেন আপনার থেকে না হারায়। সূর্যাস্ত পর্যন্ত অধিক পরিমাণে যিকির, দো‘আ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ পড়তে থাকুন, তাওবা ও ইস্তিগফার করুন। দো‘আর সময় ক্বিবলামুখী হয়ে, দু’হাত উত্তোলন করুন। দো‘আর সময় আপনি যেন বিনীত, নম্র এবং স্বীয় স্রষ্টা ও মুনিবের প্রতি মুখাপেক্ষী অবস্থায় থাকেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি শুনুন:

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَـا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُـوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

“সর্বোত্তম দো‘আ হলো ‘আরাফার দিনের দো‘আ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছি, তম্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো এ দো‘আ যে: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ্‌ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সব কিছুর

ওপর ক্ষমতাবান"।

আপনার রবের কাছে আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করুন।

প্রিয় ভাই, আপনি এমন সব আমল থেকে সতর্ক থাকুন, যা এ মহান স্থানে আপনার সাওয়াব ও পূণ্য নষ্ট করে দেবে।

‘আরাফার দিন হাজীদের যে সকল ভুল হয়ে থাকে

‘আরাফার দিন কতিপয় হাজীদের পক্ষ থেকে কিছু ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ধরনের কিছু ভুল আমরা আপনার সামনে তুলে ধরছি যেন আপনি তা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

১. কতিপয় হাজী সাহেব ‘আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন। অথচ স্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা এর সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সচেতন করা ও দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে বহু চেষ্টা-সাধনা করা হয়। কিন্তু তাদের তাড়াহুড়ার কারণে এবং আগে-ভাগে ‘আরাফা থেকে বের হয়ে যেতে চাওয়ার কারণে এ মহান রুকনটি পালনে তারা ব্যর্থ হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হজ হলো ‘আরাফায় অবস্থান।”[20]

২. কোনো কোনো হাজী পাহাড়ে উঠার জন্য কষ্ট করে এবং পাহাড় ও পাহাড়ের পাথর সমূহ মাসেহ করে

[20]. হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ।

থাকে। তাদের বিশ্বাস হলো -এ পাহাড়ের এমন বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত রয়েছে যার ফলে সে কাজ করা ওয়াজিব। অথচ এটা এমনই এক বেদ'আত যা পরিহার করা উচিৎ। ওয়াজিব তো হলো: 'আরাফার সীমানার ভেতরে যে কোনো স্থানে হাজীদের অবস্থান করা।

৩. বহু হাজী 'আরাফার দিন হাসি, ঠাট্টা ও অনর্থক বাক্যালাপে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং এ মহান স্থানে যিকির, দো'আ ও ইস্তেগফার করা ছেড়ে দেয়।

৪. অনেক হাজী দো'আর সময় ক্বিবলাকে পেছনে, ডানে কিংবা বাঁয়ে রেখে পাহাড়ের দিকে মুখ ফিরায়। অথচ সুন্নাত হলো পাহাড়কে আপনার ও ক্বিবলার মাঝখানে রাখা যদি তা সম্ভব হয়। আর যদি তা সম্ভব না হয় (অত্যাধিক ভীড়ের কারণে এ দিনগুলোতে সচরাচর এমনই হয়) তাহলে সুন্নাত হলো দো'আর সময় আপনার সামনে পাহাড় না থাকলেও ক্বিবলামুখী হওয়া।

৫. সূর্যাস্তের পূর্বেই কোনো কোনো হাজী 'আরাফা থেকে

চলে যায়। এমনটি জায়েয নেই। হাজীদের উচিৎ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্ত না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'আরাফা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করত: বের না হওয়া, যিনি হজের কাজ পালনকালে বলেছিলেন :

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

"আমার কাছ থেকে তোমরা হজের বিধান গ্রহণ কর"।

৬. কোনো কোনো হাজী 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে তাড়াহুড়ো করে এবং তালবিয়া পাঠ থেকে বিরত থাকে। তার সমস্ত আগ্রহ হলো: কত দ্রুত মুযদালিফায় পৌঁছতে পারবে। অথচ উত্তম হলো হাজী সাহেব ধীরস্থির ও শান্তভাবে পথ চলবেন। তাড়াতাড়ি করার স্থানে তাড়াতাড়ি করবেন এবং ভীড়ের স্থানে শান্ত ভাবে এগুবেন। প্রত্যেকটি স্থানে তার শ্লোগান হবে তালবিয়া।

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন

‘আরাফার বরকতময় দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হাজীদের জনস্রোত মুযদালিফার দিকে চলতে থাকে। প্রিয় ভাই, মুযদালিফায় পৌঁছে আপনি প্রথম যে কাজটি করবেন তা হলো মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে কসর করে পড়া। আপনি মাগরিব পড়বেন তিন রাকাত এবং এশা পড়বেন দু’রাকাত। এ রাত্রি আপনি মুযদালিফায় যাপন করবেন। একটু আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন যাতে কুরবানীর দিন হজের কাজগুলো আদায়ে তৎপর হতে পারেন। সুব্হে সাদিক উদিত হলে দেরী না করে ফজর পড়ে নিন। এরপর মাশ‘আরুল হারামের কাছে অবস্থান গ্রহণ করুন। মাশ‘আরুল হারাম মুযদালিফায় অবস্থিত একটি পাহাড়। এর কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যা হাজী সাহেবগণ দেখতে পায়। এ স্থান ছাড়াও মুযদালিফার যে কোনো স্থানে আপনি অবস্থান করতে পারেন। আর ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দো‘আ করুন, তাকবীর দিন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ুন এবং হাত তুলে বেশি

বেশি দো‘আ করুন। চারিদিক আলোকিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন।

ভোরের আলো খুব ফর্সা হয়ে গেলে সূর্যোদয়ের আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলতে থাকুন, যদি তা সহজসাধ্য হয়।

কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় নিক্ষেপের জন্য মুযদালিফা থেকে শুধু সাতটি কংকর নেয়া এবং এর বেশি না নেয়াটাই হলো সুন্নাত। বাকী কংকরগুলো মিনা থেকেই নেয়া উত্তম। তবে যে কোনো স্থান থেকেই কংকর সংগ্রহ করা যথেষ্ট। মুযদালিফা থেকেই জামারাতের সকল কংকর সংগ্রহ করতে হবে বলে অনেক লোক যে বিশ্বাস পোষণ করে, তা শুদ্ধ নয়। বরং শুদ্ধ কথা হলো: মুযদালিফা ও মিনা উভয় স্থান থেকে এগুলো সংগ্রহ করা জায়েয। এ কংকরগুলো বুটের দানার চেয়ে খানিকটা বড় হবে। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও কংকরের আকার বড় হওয়া থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

21

প্রিয় ভাই! মুযদালিফা থেকে রমীর কংকর আপনার সংগ্রহ করা হয়ে গেলে আল্লাহর অনুগ্রহে মিনার দিকে যেতে থাকুন এবং চলার সময় বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করুন। ওয়াদী মুহাসসারের কাছে পৌঁছে কিছুটা দ্রুত চলা মুস্তাহাব। এটি হলো মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে একটি উপত্যকা। তবে দ্রুত চলতে গিয়ে কাউকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়, যেরূপ আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।[22]

মুযদালিফার রাত তথা ঈদের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী, দুর্বল লোক ও শিশুদেরকে ফজরের পূর্বেই জামরায়ে ‘আকাবায় কংকর নিক্ষেপের জন্য চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর রাতের শেষভাগে- যখন রাতের এক চতুর্থাংশ কিংবা প্রায় ততটুকু পরিমাণ সময় বাকী থাকবে তখন মুযদালিফা থেকে চলে

---

21 নাসাঈ, ইবন মাজাহ, আহমাদ ও আরো অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী একে সহীহ বলেছেন ।

22 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৯।

যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।[23] এ হুকুমটি এসব লোকের জন্যই নির্দিষ্ট।

আর যারা ভীড় সহ্য করতে পারে, তাদের ওপর ওয়াজিব হলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতঃ সূর্যোদয়ের পর কংকর নিক্ষেপ করা।

[23] এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

জিলহজ মাসের দশ তারিখ কুরবাণীর দিন হাজীদের করণীয়

কুরবানীর দিন হলো সমস্ত মুসলিম দেশে মুসলিমদের ঈদের দিন। এ দিনটিকে তারা আনন্দ ও উৎফুল্লের সাথে স্বাগত জানায়। এ দিনটিই হলো হজের বড় দিন যাতে হজের অধিকাংশ কাজ সংঘটিত হয়। যেমন, কংকর নিক্ষেপ করা, হলোক করা, কুরবানী করা, বায়তুল্লার তাওয়াফ করা ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা।

প্রিয় হাজী ভাই, আপনি যখন কুরবানীর দিন সকালে মিনায় পৌঁছবেন, তখন আপনি চারটি কাজ পালন করবেন। সেগুলো হলো:

1. জামরায়ে 'আকাবায় যাবেন। এটি হলো মক্কার নিকটবর্তী শেষোক্ত বড় জামরা। সেখানে পৌঁছে তালবিয়া পড়া বন্ধ করুন। মিনাকে ডান পাশে, ক্বিবলাকে বাম পাশে ও জামরাতুল 'আকাবাকে সামনে রেখে এতে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করুন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সাথে 'আল্লাহু আকবার'

বলুন।

এটিই একমাত্র জামরা, যাতে এদিন সকাল বেলা কংকর নিক্ষেপ করা হবে। আর অন্য জামরাগুলোতে কংকর নিক্ষেপ এদিন নয়, বরং পরের সব দিনগুলোতে সূর্য ঢলে পড়ার পরই করতে হবে।

কংকর সাতটির চেয়ে কম কিংবা বেশি নিক্ষেপ করা যাবে না। আর বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা কোনো কোনো হাজী বড় পাথর, জুতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে থাকেন। কংকর নিক্ষেপের জন্য জামরার কাছে ভীড় জমানো, ধস্তাধস্তি ও আপনার মুসলিম ভাইদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন; কেননা মুসলিম ভাইদেরকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি।

কিছু লোক একসাথে সমস্ত কংকর নিক্ষেপ করে। আপনি তা থেকে সতর্ক থাকুন। যে ব্যক্তি এমনটি করবে, তার জন্য একটি কংকর মারা হয়েছে বলে ধরা হবে। আর তার উচিৎ হবে নিজের আশ পাশ থেকে

কংকর সংগ্রহ করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ পরিপূর্ণ করা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো একটি বা সকল কংকর হারিয়ে ফেলে, সে যে স্থানে রয়েছে সেখান থেকে কংকর কুড়িয়ে নিতে পারবে, যদিও সে জামরার নিকটে থাকে।

অনুরূপভাবে কতেক হাজী জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময় যে চিৎকার ও গালিগালাজ করে থাকে এ বিশ্বাসে যে, তারা শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করছে, তা থেকে ও সতর্ক থাকুন। কেননা এ হলো বাতিল ধারণা। জামরাসমূহে ধীরস্থির ও শান্তভাবে এবং দো'আ ও যিকরের সাথে কংকর নিক্ষেপ করা উচিৎ। আর জামরা সমূহে কংকর নিক্ষেপ তো নিশ্চয় আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই ওয়াজিব করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই, আপনি হাওয তথা গোলাকার বৃত্তের ভেতর কংকর নিক্ষেপের চেষ্টা করুন। কোনো কোনো হাজী স্তম্ভটিকে মারার জন্য কষ্ট করে থাকে। অথচ এতে কখনো কখনো কংকর হাওয থেকে বেরিয়ে যায়। এটা

হাজীদের ভুল। এক্ষেত্রে করণীয় হলো কংকর হাওযে ফেলা, তা দিয়ে স্তম্ভকে আঘাত করা নয়।

2. কংকর নিক্ষেপের কাজ শেষ করে আপনি হাদী কুরবানী করুন, যদি আপনি তামাত্তু বা ক্বিরানকারী হয়ে থাকেন। আর তা থেকে নিজে আহার করুন, ফকীরদেরকে দান করুন ও আহার করান এবং আপনি ভালোবাসেন এমন লোকদের হাদিয়া দিন, চাই আপনি মিনাতেই হাদী যবেহ করুন এবং এটাই উত্তম অথবা মক্কায় যবেহ করে থাকুন। তবে মক্কার হারামের সীমানার বাইরে যবেহ করবেন না।

3. হাদী কুরবানী করার কাজ যখন আপনি শেষ করবেন, তখন আপনার মাথা হলোক করুন অথবা চুল ছোট করে ছেঁটে নিন। পুরুষদের জন্য হলোক করাই উত্তম, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলোককারীদের জন্য তিনবার মাগফিরাতের দো‘আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

«اللَّهُمَّ اغْفِـرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِـرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِـرْ

لِلْمُحَلِّقِينَ»

“হে আল্লাহ! আপনি হলোককারীদের ক্ষমা করুন।হে আল্লাহ! আপনি হলককারীদের ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি হলককারীদের ক্ষমা করুন।” এরপর তিনি কসরকারী তথা চুল ছোট করে যারা ছাঁটেন তাদের জন্য একবার দো‘আ করেছিলেন।[24]

আর মেয়েরা তাদের চুলের প্রত্যেক গোছা থেকে আংগুলের মাথা পরিমাণ কাটবে।

প্রিয় ভাই, কুরবানীর দিন আপনি যখন কংকর মারবেন, চুল হলোক করবেন কিংবা ছোট করে ছাঁটবেন,তখন ইহরামের কারণে যত কিছু আপনার ওপর হারাম ছিল, শুধুমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর সব কিছু আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে। একে বলা হয় ‘প্রথম তাহাল্লুল’ (প্রথম হালাল)। এ সময় আপনার জন্য সুন্নাত হলো পাক সাফ হয়ে সুগন্ধি লাগানো এবং সুন্দর পোষাক পরিধান করা।

---

[24] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭২৮ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২০৮।

4. আপনি যখন কংকর নিক্ষেপ, হাদী কুরবানী এবং মাথার চুল হলোক কিংবা ছোট করার কাজ শেষ করবেন, তখন বায়তুল্লায় তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা করুন। এ তাওয়াফকে বলা হয় তাওয়াফে ইফাদা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ। এ তাওয়াফ করার নিয়ম উমরার তওয়াফ কিংবা তাওয়াফে কুদুমের নিয়মের মতই, যা ইতোপূর্বে আপনার উদ্দেশ্যে আমরা বর্ণনা করেছি। তবে এতে রমল (সবেগে পদ সঞ্চালন) ও ইদতিবা' (ইহরামের কাপড় ডান বোগলের নিচ দিয়ে পরা এবং ডান কাঁধ খালী রাখা) নেই। পবিত্রাবস্থায় সাধারণ পোষাক পরে আপনি এ তাওয়াফ করবেন। তাওয়াফ করা শেষ হলে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত সালাত পড়বেন। বেশির ভাগ সময় ভীড়ের কারণে হাজীদের পক্ষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে সালাত পড়া কষ্টকর হয়ে থাকে। তাই উত্তম হলো কিছুটা দূরে সরে যাওয়া, যাতে হাজী সাহেব তাওয়াফকারীদের কষ্ট না দেন এবং তাওয়াফকারীগণও তাকে কষ্ট না দেয়। এরপর পূর্ব

বর্ণনানুযায়ী যমযমের পানি পান করুন। তারপর সা‘ঈর স্থানে গিয়ে সাফা-মারওয়ায় সাত চক্কর সা‘ঈ করুন, উমরার সা‘ঈর মতই, যা আপনার উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। তামাত্তুকারীর ওপর এ সা‘ঈ ওয়াজিব। কেননা তার প্রথম সা‘ঈ ছিল উমরার জন্য। আর এ সা‘ঈ হলো হজের সা‘ঈ।

ক্বিরান ও ইফরাদকারীদের একটিই মাত্র সা‘ঈ করতে হয়। যদি তারা ইতোপূর্বে তাওয়াফে কুদুমের পর এ সা‘ঈ আদায় করে থাকেন, তাহলে সেটিই তার জন্য যথেষ্ট এবং ঈদের দিন তাওয়াফে ইফাদার পর তার আর সা‘ঈ করতে হবে না। আর ক্বিরান ও ইফরাদকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সা‘ঈ না করে থাকেন, তাহলে তাওয়াফে ইফাদার পর তার ওপর সা‘ঈ করা ওয়াজিব।

দু’একদিন দেরী করে তাওয়াফে ইফাদা আদায় করা কিংবা হজের কাজ শেষ করে মক্কা থেকে যখন বেরিয়ে যাওয়ার নিয়ত করবেন তখন বিদায়ী তাওয়াফের সাথে

মিলিতভাবে তা আদায় আপনার জন্য জায়েয এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটিই তাওয়াফ আদায় করবেন।

প্রিয় হাজী ভাই, আপনি যদি জামরায়ে ‘আকাবায় রমী করেন, হলোক কিংবা কসর করেন, তাওয়াফে ইফাদা ও এরপর সা‘ঈ করেন যদি আপনার ওপর সা‘ঈ করা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে এর দ্বারা আপনার ওপর ইহরামের কারণে যত কিছু হারাম ছিল সবই এমন কি স্ত্রীও হালাল হয়ে যাবে। আর একে বলা হয় ‘দ্বিতীয় তাহাল্লুল’ (দ্বিতীয় হালাল)।

উত্তম হলো: এ চারটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করা, যেভাবে আমরা আপনার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছি। প্রথমত: জামরায়ে আকাবায় রমী করবেন, তারপর কুরবানী করবেন, এরপর চুল হলোক বা ছোট করবেন, তরপর বায়তুল্লার তাওয়াফ করবেন এবং এরপর সা‘ঈ করবেন যদি তামাত্তুকারী হন কিংবা তাওয়াফে কুদুমের সা‘ঈ করেননি এমন ক্বিরানকারী বা ইফরাদকারী হন। এভাবেই বিদায় হজের সময় আপনার নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছিলেন।

কিন্তু এ চারটি কাজের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে একটির আগে অন্যটি করলে আপনার কোনো অসুবিধা নেই। আর আল্লাহ চাহেত আপনার হজ শুদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে কুরবানীর দিন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একের পর এক প্রশ্ন পেশ করা হয়েছিলো। তাদের কেউ কুরবানীর আগে হলোক করেছিলেন, কেউ রমী করার আগে তাওয়াফ করেছিলেন এবং এভাবে আরো ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে তাদেরকে বলেছিলেন: "করুন, এতে কোনো অসুবিধা নেই"। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের কষ্ট লাঘবকরণ, তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও করুণা। হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করে দিয়েছেন এবং যে শরী'আত প্রণয়ন করেছেন সে জন্য সকল প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য।

আইয়ামে তাশরীকে হাজীদের করণীয়

আইয়ামে তাশরীক হলো যিলহজের এগার, বার ও তের তারিখ। এগুলো পানাহার ও আল্লাহর যিকির ও স্মরণের দিন। এগুলোতে সাওম পালন করা জায়েয নেই। অবশ্য হাজীদের কেউ যদি কুরবানীর হাদী যোগাড় করতে না পারে, তাহলে সে সাওম পালন করতে পারবে।

প্রিয় ভাই, এ দিনগুলোতে আপনার ওপর নিম্নোক্ত কাজ করা ওয়াজিব:

১. মিনায় তিনরাত্র যাপন। আর আপনি দ্রুত প্রস্থানকারী হলে তাহলে দু'রাত্র যাপন। ওয়াজিব হলো মিনায় রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করা, চাই রাতের প্রথম ভাগে হোক অথবা শেষ ভাগে। তবে উত্তম হলো পুরো রাতই মিনায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফ ও সা'ঈর ন্যায় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া রাতে কিংবা দিনে সেখানে থেকে বের না হওয়া। এ রাতগুলো যাপনের পর হাজী তার বাসস্থানে ফিরে

যাবে।

২. প্রতিদিন সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ। সূর্য ঢলে পড়ার আগে পাথর নিক্ষেপ জায়েয নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার পরে ছাড়া কখনো নিক্ষেপ করেন নি। যদি তা জায়েযই হতো, তাহলে উম্মতের ওপর কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি তা করতেন। তিনটি জামরায় রমী করার নিয়ম নিম্নরূপ:

ক. প্রথম জামরা, যা মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী সেখান থেকে শুরু করুন। সেখানে পরপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করুন। নিক্ষেপের সময় প্রত্যেকটি কংকরের সাথে হাত উঠাবেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের পর আল্লাহু আকবার বলুন। কংকর হাওয তথা গোলবৃত্তে পতিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। যদি বৃত্তের মধ্যে পতিত না হয়, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। এরপর এগিয়ে গিয়ে ভীড় থেকে কিছুটা সরে ক্বিবলামুখী হোন এবং দু'হাত তুলে দুনিয়া ও

আখিরাতের যত কল্যাণ চান সে সব আল্লাহর কাছে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রার্থনা করুন।

খ. এরপর মধ্যম জামরার দিকে অগ্রসর হোন এবং এতে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করুন। প্রত্যেক কংকরের সাথে আল্লাহু আকবার বলুন। তারপর এগিয়ে যান এবং ভীড় থেকে একটু দূরে সরে ক্বিবলামুখী হোন ও হাত তুলে লম্বা দো‘আ করুন।

গ. এরপর জামরাতুল ‘আকাবার দিকে যান এবং তাতে পরপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করুন। প্রত্যেক কংকরের সাথে আল্লাহু আকবার বলুন। এখানে কংকর নিক্ষেপের পর দো‘আ করবেন না। বরং পরের দিন পর্যন্ত আপনার থাকার জায়গার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করুন।

এরপর বার তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনটি জামরাতেই কংকর নিক্ষেপ করুন, ঠিক যেমনিভাবে প্রথমদিন করেছিলেন।

আর যদি আপনি দ্রুত প্রস্থানকারী হন, তাহলে বার তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যান

এবং বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় গমন করুন। যদি আপনি বিলম্বে প্রস্থান করতে চান, তাহলে তের তারিখের রাত মিনায় যাপন করুন এবং ঐ দিন সূর্য ঢলে পড়ার পর পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করুন।

প্রিয় হাজী ভাই, এ দিনগুলোতে আপনার জন্য সুন্নাত হলো ফরয সালাত সমূহের পর তাকবীর পড়া এবং দিন-রাত বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা -কুরবানীর সময়, খাওয়ার সময় এবং আপনার প্রত্যেকটি অবস্থায়।

বিদায়ী তাওয়াফ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই আল্লাহর অশেষ কৃপা ও দয়ায় হাজীগণ পরিপূর্ণভাবে হজের সকল কাজ আদায় করার পর এই তো এক্ষণে হাজীদের কাফেলাসমূহ পবিত্র ভূমি থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের এ বরকতময় সফরের সমাপ্তি ঘটবে বিদায়ী তাওয়ফের মাধ্যমে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য

যারা মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে চান, এ তাওয়াফই হলো তাদের জন্য হজের সর্বশেষ ওয়াজিব কাজ। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»

“বায়তুল্লার তাওয়াফ প্রত্যেক ব্যক্তির শেষ কাজ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মক্কা থেকে বেরিয়ে না যায়।”[25]

তবে যে সকল মহিলা হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রয়েছে, এ ব্যাপারে তাদেরকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। অতএব, তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ তরক করা জায়েয। তবে তারা ছাড়া আর কারো জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ত্যাগ করা জায়েয নেই।

ঠিক উমরার তাওয়াফের যে নিয়ম, বিদায়ী তাওয়াফের নিয়মও তেমনি। অবশ্য এ তাওয়াফ হাজী তার স্বাভাবিক পোশাক পরেই করবে এবং এতে রমল ও

[25] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৮৩।

ইদতিবা’ করা সুন্নাত নয়। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু’রাকাত সালাত পড়ুন। এরপর মসজিদুল হারাম থেকে বেরিয়ে পড়ুন এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো‘আটি পাঠ করুন:

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْــأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»

“আল্লাহর নামে (বেরিয়ে যাচ্ছি)। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।”[26]

এরপর আপনি নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধান আপনাকে ঘিরে রাখবে। বিদায়ী তাওয়াফের পর যদি আপনি থাকাবস্থায়ই ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায় কিংবা আপনি নফল সালাত পড়তে চান, তাহলে তাতে

[26] ইতঃপূর্বে হাদিসটির বিবরণ দেয়া হয়েছে । এর প্রথমাংশ ইবনে সুন্নী বর্ণনা করেছেন যা আলবানী হাসান বলেছেন এবং শেষাংশ মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অসুবিধা নেই। তবে আপনি দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে পারবেন না। চেষ্টা করুন যেন বিদায়ী তাওয়াফটাই মক্কায় যেন আপনার শেষ অবস্থান হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ যিয়ারত

প্রিয় মুসলিম ভাই, আল্লাহ যখন আপনার হজ পূর্ণ করার সামর্থ দিয়েছেন এবং যে মসজিদুল হারামে একটি সালাত আদায় অন্যত্র একলক্ষ সালাত আদায়ের সমতুল্য, সেখানে সালাত আদায়ের তাওফীক দিয়ে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করলেন, তখন এ মহান অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করার অংশ হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতস্থল, পবিত্র ও বরকতময় মদীনা নগরীতে অবস্থিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করা। ফলে আপনি মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করতে পারবেন, যাতে একটি সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সমতুল্য।

প্রিয় ভাই, আপনাকে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি:

1. পবিত্র মসজিদে নববী যিয়ারত করার সাথে হজের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা এর যিয়ারত হজের কোনো ওয়াজিব বা রুকন কোনোটাই নয়। বৎসরের সব সময়ই তা মুস্তাহাব। হারামাইন শরীফাইনের দেশে আপনার অবস্থানের কারণেই এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা সংগতিপূর্ণ।

যে হাদীসে বলা হয়েছে: "যে হজ করেছে অথচ আমার যিয়ারত করলো না, সে আমাকে কষ্ট দিল।" সে হাদিসটি বানোয়াট, যার বর্ণনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুদ্ধ নয়।

2. যিয়ারতকারী ভাই, আপনি যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন, তখন আপনার জন্য মুস্তাহাব হলো- প্রবেশের সময় আগে ডান পা দেওয়া ও বলা :

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسُوْلِ الله، اللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْــوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَــدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»

এ হাদীসের অর্থ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।[27]

3. অন্যান্য মসজিদের মতই মসজিদে নববীর তাহিয়্যাতের দু'রাকাত সালাত আদায় করবেন। এতে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করবেন। উত্তম হলো তা রওযা শরীফে (রিয়াদুল জান্নায়) আদায় করা। এ স্থানটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর ও তাঁর যে হুজরায় এখন তাঁর কবর রয়েছে - এর মাঝামাঝি অবস্থিত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَـــا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَـــةٌ مِنْ رِيَـــاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»

"আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝখানের স্থানটি জান্নাতের বাগিচা সমূহের একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বর আমার হাওযের উপর অবস্থিত।"[28]

---

27 দেখুন পৃ. নং ১৩

28 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৩৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৩৬।

আর আপনি এমনটি করতে না পারলে হারামের ভেতর যে স্থানেই মুনাসিব হয়, সেখানে দু'রাকাত পড়ে নিন।

৪. এরপর আপনি সালাম দেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে গমন করুন। আদব শিষ্টাচারের সাথে স্বর নিচু রেখে তাঁর কবরের সামনে আপনি দাঁড়ান। এরপর এ বলে সালাম দিন:

«السلام عليـك أيهـا النبي و رحمة الله و بركاتـه، اللّٰهُمَّ صـل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبـراهيم و على آل إبـراهيم إنك حميد مجيد. اللّٰهُمَّ بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»

আর নিচের দো'আটি যদি বলেন, তবে কোনো অসুবিধা নেই:

«أشـهد أنـك رسـول الله حقـاً، و أنـك بلغت الرسـالة و أديت الأمانة، و جاهدت في الله حق جهاده، و نصحت الأمـة فجـزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল।

নিশ্চয় আপনি বাণী প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করেছেন, উম্মতকে নসীহত করেছেন। আল্লাহ আপনাকে আপনার উম্মতের পক্ষ হতে সে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন, যা তিনি একজন নবীকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়ে থাকেন”।

এটা বলায় কোনো দোষ নেই এজন্য যে, এসবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর অন্তর্গত।

এরপর কিছুটা এগিয়ে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম করুন এবং রহমত, মাগফিরাত ও উত্তম বিনিময়ের যা কিছু তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা দিয়ে তার জন্য দো‘আ করুন। এরপর এগিয়ে কিছুটা ডানে সরে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম করুন এবং রহমত, মাগফিরাত ও উত্তম বিনিময়ের যা কিছু তার জন্য মুনাসিব তা দিয়ে তার উদ্দেশ্যে দো‘আ করুন।

৫. **প্রিয় ভাই,** মসজিদে নববী যিয়ারতকারীদের কেউ

কেউ এমন কিছু কাজ করে যা তাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার পরিপন্থী, যে নবী মুহাম্মাদকে তারা তাঁর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে মান্য করে থাকে। সুতরাং আপনি তাঁর সুন্নাত বিরোধীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকুন। কোনো কোনো যিয়ারতকারী আবার আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় হুজরা বা এর জানালা মাসেহ করে এবং এর চারপাশে তাওয়াফ করে। কেউ কেউ আবার রাসূলের কাছে নিজের অভাব মোচন কিংবা রোগের আরোগ্য ইত্যাদি প্রার্থনা করে থাকে। এসবের কিছুই জায়েয নেই। যদি তা সঠিকই হতো, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা করার নির্দেশ দিতেন এবং আমাদের আগেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ী'ন তা করতেন।

৬. মহিলাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ও অন্য কারো কবর যিয়ারত জায়েয নেই। তবে মহিলারা মসজিদে নববী যিয়ারত করতে পারবে এবং এতে ইবাদাতও করতে পারবে।

তারা নিজ স্থানে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম পাঠাবে। আর তারা যেখানেই থাকুক সে সালাম তাঁর কাছে পৌঁছবে।

7.প্রিয় যিয়ারতকারী ভাই, মদীনায় অবস্থান কালে পুরুষদের জন্য সুন্নাত হলো বাকী' এর কবর যিয়ারত করা। বাকী'তে যাদের কবর রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন 'আফফান। পুরুষদের জন্য আরো সুন্নাত হলো হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ ওহুদের শহীদ সাহাবাদের কবর যিয়ারত করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কবর যিয়ারত করেছেন এবং তাদের জন্য দো'আ করেছেন। তাদের কবর যিয়ারতকালে তিনি বলতেন:

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِين أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

“হে কবরবাসী মুমিন, মুসলিমগণ; আপনাদের ওপর

শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ চাহেত আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি”।[29]

৮. যিয়ারতকারী ভাই ও বোনেরা, যে সকল স্থান যিয়ারত করা শরী‘আতে বৈধ তম্মধ্যে রয়েছে মসজিদে কুবা। “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে চড়ে ও হেঁটে এ মসজিদ যিয়ারত করতেন এবং তাতে দু’রাকাত সালাত আদায় করতেন।”[30] এতে সালাত পড়ার ফযীলত সম্পর্কে স াহল ইবন হানীফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَطَهرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاء فَصَلَّى فِيْهِ صَلاَةً كَانَ لَه كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»

[29] এ দোয়াটি সহীহ মুসলিমের দু’টো হাদীস থেকে সংকলিত ।

[30] ইবন উমার থেকে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন, দেখুন সহীহ বুখারী-১১৯৩, সহীহ মুসলিম-৩৪৫৬।

"যে ব্যক্তি নিজ গৃহে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে কুবায় এসে সালাত পড়ে, তার একটি উমরাহ করার সাওয়াব হবে।"[31]

হজ ও উমরাহ পালনকারী ভাই!

এই বইয়ের শেষে এখন আপনাকে কিছু অসীয়ত করছি। সম্ভবত এদ্বারা আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন। পবিত্র ঘরের আঙিনা আনুগত্যের সহায়ক এবং নাফরমানী ও পাপ বিতাড়নকারী।

প্রথমত: মসজিদুল হারামে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে সচেষ্ট থাকুন। আগে ভাগে পৌঁছতে নিজেকে বাধ্য করুন। সালাতের মধ্যে যথাসম্ভব ধ্যানমগ্ন হওয়া ও বিনয়াবনত থাকার চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয়ত: কুরআন পাঠ আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় উপায় সমূহের একটি। সুতরাং আপনার এ হজ ও উমরার মধ্যে কুরআনের কতকাংশ চয়ন করে তা পাঠ

[31] নাসাঈ, ইবন মাজাহ, আহমাদ ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত । আলবানী সহীহ বলেছেন ।

করুন, আপনার সাধ্যানুযায়ী আপনি তা ঠিক করুন।

তৃতীয়ত: মসজিদুল হারামে সালাত পড়া অন্য মসজিদে এক লক্ষ বার সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। অতএব, এখানে বেশি বেশি নফল ও সুন্নাত আদায়ে সচেষ্ট থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে জান্নাতে তাঁর সাহচর্য প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, “অধিক স াজদাহ দিয়ে আপনার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করুন”।[32]

চতুর্থত: সকাল-সন্ধ্যার যিকিরসমুহ রীতিমত পাঠ করা কল্যাণকর কাজ। তাই এ যিকির গুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে কিছু গ্রন্থ ও লিফলেট সংকলিত হয়েছে। যেমন, তম্মধ্যে একটি গ্রন্থ উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শাইখ বকর ইবন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ লিখেছেন।

পঞ্চমত: সুন্দর চরিত্র ও সুন্দর মোয়া’মেলার পরিচয় দিতে চেষ্টা করুন। গীবত, চোগলখুরী ও কষ্টদায়ক কথা

---

32 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১২২।

বলে কারো মন্দ দিকটি উল্লেখ করা থেকে সতর্ক থাকুন। জেনে রাখুন, মক্কায় গোনাহ ও নাফরমানীর কাজ অন্যত্র গোনাহ ও নাফরমানী করার চেয়ে আল্লাহর কাছে ভয়াবহ ও মারাত্মক।

ষষ্ঠত: প্রিয় ভাই, আপনি আল্লাহর কাছে তাওবা করার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হোন। আপনার জীবনের নতুন একটি অধ্যায় উম্মুক্ত করুন, যা হবে ঈমান ও পূণ্য কাজে ভরপুর। আর এ বরকতময় সফরটা যেন কল্যাণের সে দরজায় পরিণত হয় যা আপনাকে আপনার স্রষ্টা ও প্রভুর নিকটবর্তী করে দেবে।

সর্বশেষে: হজ ও উমরাপালনকারীদের হাদিয়াদান সংস্থা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করছে -তিনি যেন আপনাদের প্রচেষ্টার প্রতিদান দেন, আপনাদের হজ ও উমরাহ কবুল করেন, আপনাদেরকে স্বজনদের কাছে নিরাপদে ও বিত্তশালী হয়ে ফিরিয়ে নেন এবং আমাদের ও আপনাদের সকলকেই দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার এবং উত্তম কাজ করার তাওফীক দেন।

কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত কিছু দো‘আ

﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣﴾ [الاعراف: ٢٣]

“হে আমাদের রব। আমরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২৩]

﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧ وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨﴾ [البقرة: ١٢٧، ١٢٨]

“হে আমাদের রব! আপনি আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আর আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৭-১২৮]

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠﴾

[ابراهيم: ٤٠]

“হে আমাদের রব! আমাকে করুন সালাত কায়েমকারী এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর কবুল করুন আমার দো‘আ।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

﴿ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ﴾ [النمل: ١٩]

“হে আমাদের রব! আপনি আমাকে সামর্থ দিন যাতে আমি আপনার সে নি‘আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৯]

﴿قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ۝٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ۝٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ۝٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ۝٢٨﴾ [طه: ٢٥، ٢٨]

“হে আমাদের রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং

আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ২৫-২৮]

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤٧﴾ [ال عمران: ١٤٧]

“হে আমাদের রব! ক্ষমা করে দিন আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে আমাদের বাড়াবাড়ি, আর আমাদেরকে অবিচল রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৭]

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ١٠﴾ [الكهف: ١٠]

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করে দিন”। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০]

﴿ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ٩٨ ﴾ [المؤمنون: ٩٧، ٩٨]

"হে আমাদের রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং হে রব! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৯৭-৯৮]

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আর আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের রব! আর আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের মাফ করুন, ক্ষমা করুন ও আমাদের

প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨﴾ [ال عمران: ٨]

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে আপনি বক্র করবেন না। আর আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয় আপনি বড় দানকারী।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮]

﴿رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦﴾ [الفرقان: ٦٤، ٦٥]

“হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি হলো বিনাশ। বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসাবে তা কতইনা নিকৃষ্ট জায়গা।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৪-৬৫]

﴿رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٣]

“হে আমাদের রব! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা হবে আমাদের নয়নমনি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম ও নেতা বানিয়ে দিন।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৩]

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَـا بَاعَـدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْـرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ফেতনা ও আযাব হতে, কবরের ফেতনা ও কবরের আযাব হতে, ঐশ্বর্য্যের ফিতনার অনিষ্ট এবং দারিদ্রের ফেতনার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দাজ্জালের ফেতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরকে বরফ ও শিশিরের পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আর আমার অন্তরকে পাপ থেকে এমনভাবে পরিস্কার করে দিন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। আমার ও আমার পাপের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে দিন, যেভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অলসতা,পাপাচার ও ঋণভার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।[33]

[33] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, কাপুরুষতা ও অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থা ও কৃপণতা হতে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে এবং জীবন ও মরনের ফেতনা হতে।"[34]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ».

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কঠিন মুসিবত, চরম কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের মনতুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[35]

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ».

[34] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

[35] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

“হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দীনকে সঠিক করে দিন যা আমার কাজ কর্মের নিরাপত্তাবিধায়ক। আর আমার জন্য আমার দুনিয়াকে সঠিক করে দিন যাতে রয়েছে আমার জীবিকা। আমার জন্য আমার আখিরাতকে ও শুদ্ধ করে দিন যার দিকে হবে আমার প্রত্যাবর্তন। আমার জীবনকে প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে বৃদ্ধি করুন এবং আমার মৃত্যুকে সকল অনিষ্টতা থেকে আরাম লাভের উপায় করে দিন”।[36]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রক পরিশুদ্ধি ও অভাবমুক্তি প্রার্থনা করি”।[37]

«اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا».

“হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে প্রদান করুন তাকওয়া

---

36 সহীহ মুসলিম

37 সহীহ মুসলিম

এবং একে পরিশুদ্ধ করুন। আপনিই সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনিই এর অভিভাবক ও মুনিব। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন ইলম থেকে যা উপকারী নয় এবং এমন হৃদয় থেকে যা বিনয়াবনত হয় না ও এমন দো‘আ’ থেকে যা কবুল হয়না”।[38]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِـكَ وَتَحَـوُّلِ عَافِيَتِـكَ وَفُجَـاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়া থেকে, আপনার দেওয়া সুস্থতা পরিবর্তিত হওয়া থেকে, আকস্মিক আপনার শাস্তি আপতিত হওয়া থেকে এবং আপনার সকল ক্রোধ থেকে।”[39]

«اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِيْ وَوَلَدِيْ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي، وَأَطِلْ حَيَـاَتِيْ عَلَى طَاعَتِكِ وِأَحْسِنْ عَمَلِيْ، وَاغْفِرْ لِيْ».

38 সহীহ মুসলিম

39 সহীহ মুসলিম

“হে আল্লাহ! আমার সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন। আপনি যা আমাকে দিয়েছেন তাতে আমার জন্য বরকত দিন। আপনার আনুগত্যের ওপর আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করুন। আমার আমল সুন্দর করুন ও আমাকে ক্ষমা করুন।”[40]

«لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِيمِ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

“সহনশীলতার অধিকারী মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। আরশের মহান অধিপতি ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। আসমান সমূহ ও যমীনের মালিক এবং আরশের সম্মানিত অধিপতি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ্ নেই।”[41]

«اللَّهُمَّ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».

[40] প্রথমাংশ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে এবং শেষাংশে আছে সহীহ বুখারীর আল-আদাব আল-মুফরাদে ও তিরমিযীতে।

[41] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

“হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত প্রত্যশা করি। অতএব চোখের এক পলকের জন্যও আপনি আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন না। আর আপনি আমার সকল ব্যাপার সংশোধন করে দিন। আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই।”[42]

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আপনার হাতেই আমার ভাগ্য আপনার হুকুম আমার ওপর কার্যকর হয়েছে। আপনার ফয়সালা আমার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত। আপনার সকল নামের অসীলায় আপনার কাছে প্রর্থনা করি, যে নামে আপনি নিজেকে নামকরণ করেছেন অথবা যে নাম আপনি স্বীয় গ্রন্থে নাযিল

[42] আবু দাউদ, আহমাদ, আলবানী ও অন্য অনেকে একে হাসান বলেছেন।

করেছেন কিংবা আপনার সৃষ্টি কাউকে তা শিখিয়েছেন, বা কোনো আপনার কাছে গায়েবী এলেমে তা গোপন করে রেখেছেন- আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের মধ্যমণি করে দিন, একে আমার বুকের জ্যোতি, আমার দু:খের নিরসন ও আমার দুশ্চিন্তার অবসান করে দিন।”[43]

«اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ».

“হে আল্লাহ! অন্তকরন সমূহের পরিবর্তন সাধনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।”[44]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কর্ণের অনিষ্টতা থেকে, আমার দৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে, আমার জিহবার অনিষ্টতা থেকে, আমার হৃদয়ের

43 আহমাদ, হাকেম, ইবন হাজার একে হাসান বলেছেন এবং আলবানী শুদ্ধ বলেছেন।

44 সহীহ মুসলিম

অনিষ্টতা থেকে ও আমার বীর্যের যে কোনো অনিষ্টতা থেকে।”[45]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চরিত্র, আমল ও প্রবৃত্তির অন্যায় সমূহ থেকে।”[46]

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল উদার, আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন”।[47]

«اللّٰهُمَّ إني أسألك فعل الخيرات، و ترك المنكرات، و حب المساكين، و أن تغفر لي، و ترحمني، و إذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، و أسألك حبك و حب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك».

[45] আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী। আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

[46] তিরমিযী, ইবন হিব্বান, হাকেম, তাবারানী।

[47] তিরমিযী।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি উত্তম কাজ সমূহ করা, অন্যায় পরিত্যাগ করা এবং মিসকীনদেরকে ভালোবাসার তাওফীক লাভের, আর এটা যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং রহম করবেন। আপনি যখন কিছু লোকের ফেতনা চান, আমাকে তখন ফেতনাহীন অবস্থায় মৃত্যু দিন। আমি প্রার্থনা করি আপনার ভালোবাসা, আপনি যাকে ভালোবাসেন তার ভালোবাসা এবং এমন আমলের ভালোবাসা যা আমাকে আপনার ভালোবাসার কাছে পৌঁছে দেয়।”

«اللّٰهُمَّ إني أسألك من الخير كله: عاجله و آجله، ما علمت منه وما لم أعلم، و أعوذ بك من الشر كله: عاجله و آجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللّٰهُمَّ إني أسألك من خير ما سألك عبدك و نبيك، و أعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك و نبيك، اللّٰهُمَّ إني أسألك الجنة، و ما قرب إليها من قول أو عمل، و أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، و أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি, এসবের যা আমার জানা রয়েছে এবং যা আমার জানা নেই সবই চাই। আমি আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, এর যা আমার জানা রয়েছে এবং যা জানা নেই, সে সব থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি সে কল্যাণ যা আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে চেয়েছেন। আমি সে অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। হে আল্লাহ! জান্নাত এবং যে কথা কিংবা কাজ জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেয় আমি তা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আর জাহান্নাম এবং যে কথা কিংবা কাজ জাহান্নামের কাছে পৌঁছে দেয় আমি তা হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনি যা কিছু আমার জন্য নির্ধারণ করেন তা যেন আমার জন্য কল্যাণকর করেন সে কামনা আমি আপনার কাছে করছি।”[48]

---

[48] ইবন মাজাহ।

«اللَّهُمَّ احفظـني بالإسـلام قائمـاً، واحفظـني بالإسـلام قاعـداً، واحفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمت بي عدواً، ولا حاسداً، اللَّهُمَّ إني أسـالك من كل خيرخزائنـه بيـدك، و أعـوذ بـك من كل شر خزائنه بيدك».

"হে আল্লাহ! দাঁড়ানো অবস্থায় ইসলাম দ্বারা আমাকে হেফাযত করুন, বসা অবস্থায় ইসলাম দ্বারা আমাকে হেফাযত করুন এবং শয়ন অবস্থায় ইসলাম দ্বারা আমাকে হেফাযত করুন। কোনো শত্রু ও হিংসুককে আমার দ্বারা তুষ্ট করবেন না। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সে সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি যার ভান্ডার আপনার হাতে এবং সে সব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যার ভান্ডারও আপনার হাতে।"[49]

«اللَّهُمَّ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصـيك، و من طاعتك ما تبلغنابه جنتك، و من اليقين ما تهون بـه علينـا مصائب الدنيا، و اللَّهُمَّ متعنا بأسـماعنا، و أبصـارنا،و قواتنـا مـا

[49] হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন, একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

أحييتنا، و اجعله الوارث منـا، واجعـل ثأرنـا على من ظلمنـا، و انصرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصـيبتنا في ديننـا، ولا تجعـل الدنيا أكـبر همنـا،و لا مبلـغ علمنـا، و لا تسـلط علينـا من لا يرحمنا».

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন ভয়-ভীতি দান করুন যদ্বারা আমাদের ও আপনার নাফরমানীর মাঝখানে আপনি অন্তরায় সৃষ্টি করে দেবেন। আর এমন আনুগত্য দান করুন, যদ্বারা আপনি আমাদেরকে আপনার জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। আর এমন প্রত্যয় দান করুন, যদ্বারা আপনি আমাদের ওপর দুনিয়ার সকল বিপদাপদ সহজ করে দেবেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা উপকৃত করুন যতদিন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আর এসবকে আমাদের অধিনস্ত রাখুন। যারা আমাদের ওপর যুলুম করেছে তাদের ওপর আমাদের প্রতিশোধের ব্যবস্থা করুন। যারা আমাদের শত্রুতা করে তাদের ওপর আমদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের মুসীবতকে আমাদের দ্বীনের মধ্যে নিপতিত করবেন না। দুনিয়াকে আমাদের

সবচেয়ে বড় কামনার বস্তু ও জ্ঞানের শেষ সীমা করে দেবেন না। আর যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না তাকে আমাদের ওপর আধিপত্য দান করবেন না।”[50]

«اللّٰهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثـيراً و لا يغفـر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

“হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর বহু যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া কেউই এসব পাপ ক্ষমা করতে পারবে না। অতএব আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”[51]

«اللّٰهُمَّ إنا نسألك موجبات رحمتك، و عزائم مغفرتك، والســـلامة من كل إثم، و الغنيمة من كل بر، و الفــوز بالجنــة، و النجــاة من النار»

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনার রহমত এবং আপনার ক্ষমার নিশ্চিত উপকরণ, সকল

---

50 তিরমিযী, হাকেম, আর হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী এতে একমত হয়েছেন।

51 সহীহ বুখারী ও মুসলিম

পাপ থেকে নিরাপত্তা, সকল পূণ্যের অধিকারী, জান্নাত লাভের সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি”।[52]

«اللّٰهُمَّ اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري».

“হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের এবং জীবনের শেষমুহূর্তে আমার ওপর আপনার রিযিক প্রশস্ত করে দিন।”[53]

«اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك أن أشرك بك و أنا أعلم، و أستغفرك لما لا أعلم».

“হে আল্লাহ! আমি জেনেশুনে আপনার সাথে শির্ক করা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি আর আমি যা জানি না তা হতে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”[54]

«اللّٰهُمَّ إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, উত্তম

---

52 হাকেম একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

53 হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহীহ বলেছেন।

54 আহমাদ বর্ণনা করেছেন আলবানী সহীহ বলেছেন।

ও হালাল রিযিক এবং গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করছি।”[55]

«اللّٰهُمَّ إني أسألك خير المسألة، و خير الدعاء، و خـير النجـاح، و خيرالعمل، و خـير الثواب، و خـير الحيـاة، و خـير الممـات، و ثبتني، وثقل موازيني، و حقق إيمـاني، و ارفـع درجـاتي، و تقبـل صلاتي، اغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنــة، اللّٰهُمَّ إني أسألك فواتح الخير و خواتمه و جوامعــه ، و أوله و ظـاهره، و باطنه، الدرجات العلى من الجنة آمين. اللّٰهُمَّ إني أسـألك خـير مـا آتي، و خير ما أفعل، و خير ما أعمل، و خير مـا بطن و خـير مـا ظهر، والدرجات العلى من الجنة آمين. اللّٰهُمَّ إني أسـألك أن ترفـع ذكري، و تضع وزري، و تصـلح أمـري،و تطهـر قلـبي،و تحصـن فرجي،و تنور قلبي،و تغفر لي ذنبي، و أسألك والدرجات العلى من الجنة آمين. اللّٰهُمَّ إني أسألك أن تبارك في نفسي، و في ســمعي و في بصري، و في روحي، و في خَلقي،و في خُلُقي،و في أهلي، وفي محياي، وفي مماتي،و في عملي، فتقبل حسناتي، أسألك والدرجات العلى من الجنة آمين».

---

[55] ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন, আলবানী সহীহ বলেছেন।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম প্রশ্ন করি, উত্তম দো‘আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সওয়াব, উত্তম জীবন, উত্তম মৃত্যু চাই। আমাকে অবিচল রাখুন, আমার পাল্লাসমূহ ভারি করুন, আমার ঈমান বাস্তবায়িত করুন, মর্যাদা সুউচ্চ করুন, সালাত কবুল করুন, আমার গুনাহ মাফ করুন। আর জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা আমি আপনার কাছে কামনা করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে কামনা করি শুরুর কল্যাণ, শেষের কল্যাণ ও সার্বিক কল্যাণ, প্রথম কল্যাণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কল্যাণ আর জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা। হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন। হে আল্লাহ আমি যা নিয়ে আসি, যা করি ও যা আমলে নেই এ সবের কল্যাণ আপনার কাছে কামনা করি। আরো কামনা করি যা গোপন থাকে তার কল্যাণ, যা প্রকাশিত হয় তার কল্যাণ এবং জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা। হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন। হে আল্লাহ! আমি চাই আপনি আমার স্মরণকে সুউচ্চ করুন, আমার পাপ মুছে দিন, আমার ব্যাপারে সুরাহা করুন। আমার অন্তর পবিত্র

করুন, আমার গুপ্তস্থান হেফাযত করুন, আমার অন্তর আলোকিত করুন, আর আমার পাপ ক্ষমা করুন। এটা আমি কামনা করছি, আর আপনার কাছে চাই জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা সমূহ। হে আল্লাহ! কবুল করুন। হে আল্লাহ! আপনার কাছে চাই আপনি আমার আত্মাকে বরকতময় করুন, বরকত দিন আমার শ্রবণে, দৃষ্টিতে, রূহে, সৃষ্টিতে, চরিত্রে, পরিবার-পরিজনে, জীবনে, মৃত্যুতে, কাজেকর্মে, সুতরাং আমার নেক কাজসমূহ কবুল করুন। এটা আমি কামনা করছি, আর আপনার কাছে চাই জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা সমূহ।”[56]

«اللّٰهُمَّ متعني بسمعي، و بصري، واجعلهما الوارث مــني، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري».

“হে আল্লাহ! আমাকে আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে উপকৃত কর এবং আমার পক্ষ হতে এ দুয়ের উত্তরাধিকারী তৈরি কর। আর যে আমার ওপর অন্যায়

[56] হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

করেছে তার ওপর আমাকে সাহায্য কর এবং তার থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।”[57]

«اللّٰهُمَّ إني أسالك عيشة نقية، و ميتة سـوية، و مـرداً غـير مخزي ولا فاضح».

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বচ্ছ সুন্দর জীবন যাপন, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং অপমান ও লাঞ্ছনাহীন প্রত্যাবর্তন কামনা করছি।”[58]

«اللّٰهُمَّ صل على محمد و على آل محمد كما صـليت على إبـراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللّٰهُمَّ بـارك على محمـد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»

“হে আল্লাহ! আপনি সালাত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার বর্গের ওপর যেভাবে তা করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের ওপর, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ! আপনি

[57] তিরমিযী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

[58] বাযযার এটি যাওয়ায়েদে বর্ণনা করেছেন এবং তাবারানীও।

বরকত দান করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার বর্গের ওপর যেভাবে তা করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের ওপর, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদা সম্পন্ন"।

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে হজ। আলোচ্য রচনাটিতে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হজ, উমরা ও যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি বিস্তারিত তুলে ধরার পাশাপাশি মাসনূন কিছু দো'আও উল্লেখ করা হয়েছে।